শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি

ভক্তচরিত গ্রন্থাবলী নং ১

সাধু-চরিত।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জীবনী প্রভৃতি এবং

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত রচয়িতা

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি প্রণীত

শ্রীসূর্য্যকুমার দেব কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১৩ ৯

মূল্য আট আনা

ভূমিকা

প্রায় আট বৎসর পূর্ব্ব হইতে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের চেষ্টা হয় তৎকাল হইতেই নানাস্থানের, নানা ঘটনার ও নানা ব্যক্তির কীর্ত্তি-কথা সংগৃহীত হইতে থাকে

আমাদের শ্রীহট্ট ভূমি বত্ন প্রসূতি এই ভূমিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতা ও পিতার জন্মভূমি শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীহট্টেরই অধিবাসী শ্রীবাস, শ্রীরাম, মুরারী গুপ্ত, চন্দ্রশেখর, পদকর্ত্তা যদুনাথ প্রভৃতি এই শ্রীহট্ট ভূমিরই গৌরব বত্ন *তাহার পরে* জগন্মোহন ও রামকৃষ্ণগোসাঞীর অভিনব বৈষ্ণব মত এই শ্রীহট্ট ভূমিতেই জাত হয়।

পরবর্ত্তী কালেও এই শ্রীহট্টই ঠাকুর বাণী ঠাকুর জীবন, পাগল শঙ্কর, রক্ষিত ঘোষ প্রভৃতি পার্ষদপ্রতীম সাধু মহাজনের পদরেণু ধারণে পুণ্য ক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়

তাহার পরেও অনেক সাধু মহাত্মা এ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় পবিত্র চরিত্র-প্রভায় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নগর আলোকিত করিয়া গিয়াছেন

নিতান্ত আধুনিক সময়ে এবং বর্ত্তমান কালেও এইরূপ মহাত্মার অসদ্ভাব এ দেশে নাই অতএব শ্রীহট্টের প্রতি বিধাতার ইহা এক শুভ আশীর্ব্বাদ, বলিয়াই আমরা মনে করি

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের উপকরণ রাজি সংগ্রহের সময় "ক্ষেম সহস্রের সাধু" মহাত্মার কথা সংক্ষিপ্ত ভাবে সর্ব্বপ্রথমে আমরা প্রাপ্ত হই কিন্তু তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারি নাই

ক্ষেম সহস্রের সাধুর বাটিকাই এক্ষণে 'সাধুর আখড়া' নামে খ্যাত হইয়াছে সাধুর স্বপরিবারস্থ কেহই নাই ; ঐ আখড়াতে এক্ষণে তদীয় চারিজন অনুগত ভক্তের অবস্থিতি সাধুর বিচিত্র চরিত্র কথা তাঁহারা স্বরক্ষিত নোট প্রদানে বেতালবাসী শ্রীকুলচন্দ্র দাস মহাশয় দ্বারা পদ্যে লিখাইয়াছিলেন তিনি "শ্রীসাধু চরিত-সুধা" নামে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃ

নিকট সাধুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করি

শ্রীসূর্য্যকুমার প্রায় আট বৎসর সাধুর একত্র ছিলেন এই 'সাধু চরিতে" বিবরিত অনেক ঘটনা তাঁহার দৃষ্ট এইরূপ প্রত্যক্ষ ও প্রমাণ্য ঘটনা নিচয় এ গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে সূর্য্যকুমার ব্যতীত সাধুর অন্যান্য অনুসঙ্গীবর্গ এবং ক্ষেমসহস্র ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামস্থ বহু ব্যক্তি এ সব ঘটনা দর্শন করিয়াছেন ও পরীক্ষা করিয়াছেন ইঁহারা প্রায় সকলেই জীবিত আছেন ও সাধু চরিত্রের সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন এ গ্রন্থে সাধুচরিত্রের কয়েকটি ঘটনা মাত্র বর্ণিত হইয়াছে বাহুল্য ভয়ে বহু কথাই গ্রন্থস্থ করা হয় নাই,—এ ত্রুটি স্বীকার্য্য

আমরা সচরাচর যাহা ঘটিতে দেখি না তাহাই অলৌকিক বলিয়া অনেক সময় অবিশ্বাস্য মনে করিয়া থাকি, কিন্তু ভক্ত জীবনে কোন্ শক্তি-বলে যে তদ্রূপ ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহার মূলানুসন্ধান করি না সম্প্রতি যোগবলের কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন কিন্তু ভক্তিযোগ যে কিদৃশী অঘটন-ঘটন পটীয়সী শক্তিময়ী তাহা মনে করিয়া দেখি না এই সাধু চরিত্র তাহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রদর্শন করিবে

এক্ষণে দেশবাসী শিক্ষিত ও সাধারণের কাছে তাঁহাদের নিজস্ব জিনিসের আদর হইতে দেখিলেই সুখী হইব অতিশয় তাড়াতাড়িতে লিখিতে বাধ্য হওয়ায় বহু ত্রুটিই ইহাতে লক্ষিত হওয় সম্ভব

মৈনা, শ্রীহট্ট
১লা কার্ত্তিক, ১৩১৯

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

সূচীপত্র

উৎসর্গ

এ

ভবে

ভক্তি ও প্রীতি

আমাদের পরম সম্পদ

ভক্তি সাধনে মন নির্ম্মল হইলে

প্রীতির পসার বসে

প্রীতি হইতেই আনন্দ

এই

প্রিয়বালা রূপিনী প্রীতিই পরম আনন্দময়ী

ভক্তি ও প্রীতির লীলাবৈভব বর্ণনাত্মক

এই

সাধু-চরিত

তাই

ওই যুগল নামে

উৎসর্গীকৃত

হইল।

:০:

গ্রন্থকার

মঙ্গলাচরণ

ঃ০ঃ

মধুব মলয   পবন বহিছে
মধুর বাঁশরী   সুধীবে বাজিছে
মধু বৃন্দাবণ্য   আনন্দে মাতিছে
উথলি উথলি প্রেমে

অকস্মাৎ বায়ু   নিস্তব্ধ হইল
বাঁশীব নিশান   শূন্যে মিশে গেল,
মধু বৃন্দাবন   কাঁদিযা উঠিল
নহে বঁধু ব্রজ ভূমে

ন'ই বৃন্দাবণ্যে   শ্রীরাধিকানাথ
ছাড়িয গিয়াছে করিযা অনাথ ;
কাঙ্গালিনী তাই ডাকিছে   'হা নাথ,
বিবহে জ্বলিযা মবি

হে বহুবল্লভ   ছেড়ে গোপীগণ
পেযেছ পুরেব   বমণী বতন ;
মোরা গোপী তাই কান্দি অনুক্ষণ,
পাইতে চবণ তরি

ছাড়ে নাই ব্রজবন   শ্রীবাধিকানাথ ;
হইও না নিবাশ.   কবিবেন আত্মাস্মাৎ

উপক্রমণিকা।

গুরুতত্ত্ব।

এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাঁহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, শ্রীভগবানে বিশ্বাস আছে, সকলই মানেন, কিন্তু গুরুর আবশ্যকতা—গুরুগ্রহণের নিত্যতা স্বীকার করেন না এটি যে বিজাতীয় ভাব, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই ভাবিয়া দেখিলে শিষ্যত্ব আমাদের স্বভাব; জন্মের পর হইতেই শিষ্যত্ব আরম্ভ, গুরুব্যতীত আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না প্রকৃতি দেবীই আমাদিগকে শিষ্য করিয়া রাখিয়াছেন

শাস্ত্রে গুরুধ্যান আছে গুরুদেব উপাস্য, তাঁহার ধ্যানের প্রয়োজন; কিন্তু তজ্জন্য তিনি কাল্পনিক কিম্বা মানসিক ব্যাপার—ideal নহেন তিনি সুন্দর, করুণাময়; তিনি প্রফুল্ল ও শান্ত, তিনি শিষ্যকে অভীষ্ট প্রদানে সদা সমুদ্যত, তিনি বরদ

ফলতঃ যাঁহার কৃপাবলে আমাদের চিত্তের অজ্ঞান তিমির দূরীভূত হইয়া জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হয়, চির অন্ধ চক্ষু প্রকাশিত হয়, তাঁহার চরণাশ্রয় ব্যতীত—তাঁহার চরণে ভক্তিকৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ব্যতীত আমাদের সংসার-সাগরোত্তরণের আশা দুরাশা

গুরু আমাদিগকে যে অমূল্য নিধি দান করেন, পৃথিবীতে তাদৃশ বস্তু আর নাই * এ অপূর্ব্ব বস্তু প্রভাবে আমারা হীন হইয়াও যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ করি, †

* 'একমপ্যক্ষরং যস্মাদ্ গুরুঃশিষ্যে নিবেদয়েৎ
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বাচানৃণীভবেৎ ॥'

† "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং "—তন্ত্রসারে।

মর হইয়াও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হই অতএব গুরুই সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ সন্দেহ নাই —"যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ" এবং এজন্যই শাস্ত্র লন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ"

অতএব—

"সর্ব্বথা সর্ব্বযত্নেন গুরুদেবং সমাশ্রয়েৎ।"

এই গুরু দ্বিবিধ দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু যিনি নাম-মন্ত্ররূপ দিব্য জ্ঞান দানে দ্বিজত্ব বিধান করেন, তিনি দীক্ষাগুরু এবং যাহা হইতে আমরা সাধনতত্ত্বাদি শিক্ষা প্রাপ্ত হই, তিনিই শিক্ষাগুরু ভাবভেদে দ্বিবিধ হইলেও গুরুতত্ত্ব এক—অভিন্ন এবং নিত্য।

শ্রীভাগবতে এইরূপ শ্রীঅবধূতের বহুগুরু গ্রহণের উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহারা সকলই শিক্ষাগুরু

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—

"মন্ত্র গুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ
তা সবার পাদে আগে করিয়ে বন্দন" বলিয়া

শ্রীরূপ সনাতনাদি ছয় গোস্বামীকেই স্বীয় শিক্ষাগুরুরূপে বন্দনা করিয়া এই তত্ত্বেরই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন

ভক্তিরাজ্যে ঐশ্বর্য্যাপেক্ষা মাধুর্য্যেরই মহত্ত্ব পরিলক্ষিত হয় মাধুর্য্যভাব মৃদু—অনুগ্র, এইজন্য মাধুর্য্যভজনে প্রকৃতি ভাবাপন্ন হইতে হয়, এইজন্য মধুর বৃন্দাবনে "পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই" বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, আর সব স্ত্রী এই ভবসংসারে আমরা সকলই প্রকৃতি, পুরুষ একমাত্র শ্রীভগবান এইজন্যই "এ জগৎ প্রকৃতি, পুরুষাত্মক"

সসঙ্গিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধাই নিখিল ভক্ত জনের প্রতিনিধি;

এই জন্যই বৃন্দাবন ধাম আদর্শ ভজনের পুণ্যক্ষেত্র এইজন্যই সখী-অনুগতি ব্যতীত—রাগানুগা ভজন ব্যতীত ব্রজেন্দ্র নন্দন দুষ্প্রাপ্য।

"সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং
আজ্ঞাসেবা পরাং তদ্রূপালঙ্কার ভূষিতাং"

এই শ্লোকটিতে উক্ত তত্ত্বই কথিত হইয়াছে, সখী-অনুগতি ব্যতীত ব্রজেন্দ্রনন্দন দুষ্প্রাপ্য। কেবল অনুগতি নহে সেই রূপ ও গুণ-লঙ্কারে ভূষিত হইতে হইবে কৃষ্ণময়ী হইতে হইবে, আত্মপ্রীতি ত্যাগ করিতে হইবে—কৃষ্ণপ্রীতিময় জীবন হইতে হইবে। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-রূপ কামত্যাগী নিষ্কাম উপাসক হইতে হইবে; স্ত্রী সাজিয়া স্বারাজ্য চিন্তামণিময় বৃন্দাবনের প্রজা হইতে হইবে

প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগতে এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মেরই ভিত্তি ভূমি সুদৃঢ়—অনড়; ইহাই একমাত্র বিজ্ঞান ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য জ্ঞানীগণও ইহা অনুমোদন করেন; তাঁহারাও বলেন—

"If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness, it must become a woman"—*Newman*.

ধর্ম্মরাজ্যের সুপবিত্র প্রদেশে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইলে, আত্মাকে স্ত্রীরূপে বিভাবিত করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই

গুরুর মুখে এই অমৃতবাণী সাধক প্রাপ্ত হন, গুরুই শিষ্যকে হাতে ধরিয়া, সে বর্ত্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন। গুরু-কৃপায় শিষ্য তখন দিব্য-জ্ঞান লাভে গুরুর দিব্যরূপ—সে বরদরূপ দর্শনে পুলকিত হন, তখন শিষ্য তাঁহাকেই "সখী" রূপা দর্শন করিতে সমর্থ হন বাহ্যদেহে তিনি পুরুষদেহধারী হউন বা স্ত্রীদেহধারী হউন, শিষ্যের তৎপ্রতি তখন লক্ষ্য থাকে না, তখন গুরু ব্রজের সখী এবং তিনিও স্ত্রীরূপী এবং তাঁহার (সেই সখীর) সঙ্গিনী

এইরূপ হইতে পারিলেই তিনি অনেকটা কৃতার্থ ও তৃপ্ত হইয়া যান

কেননা সঙ্গিনীরূপে তিনি তখন সখীর আজ্ঞায় সেবাপরা হইয়া থাকেন।

এই তৃপ্ত অবস্থায় সাধক সেবা ও নাম ব্যতীত আর সকলই ত্যাগ করিতে পারেন। প্রিয় বঁধুর নাম আর তাঁর সেবা ; এতদ্ব্যতীত আর কিছুই তাহার অভিরুচ্য নহে।

নাম আদিতে, নাম মধ্যে, নামই অন্তে আদিতে নামই রুচির উৎপাদক হয়, মধ্যেও নামই অবলম্ব্য এবং অন্তে ইহাই প্রেমদ।

"নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়।"

যিনি প্রাণের প্রাণ, যাঁহার সেবা ও সান্নিধ্য ব্যতীত তিলার্দ্ধ থাকা অসম্ভব, তাহার নাম কতই মধুময়,—নাম-সাধকই তাহা জানেন।

এ সকল তত্ত্ব এস্থলে বিস্তার করিলাম না ; যে 'সাধু' মহাত্মার পুণ্যকথা এ গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইবে, তাঁহার জীবনেই এসব তত্ত্বের বিকাশ পাঠক দেখিতে পাইবেন

সাধু-চরিত।

জন্ম।

শ্রীহট্ট জিলায় সাম্প্রদায়িক বিপ্র অধ্যুষিত ইট পরগণা অবস্থিত শ্রীহট্ট জিলায় হটা এক প্রধান স্থান, এই স্থানেই রাজা সুবিদ নারায়ণের রাজ্য ছিল, এই স্থানেই তাঁহার পত্নী নারী ধর্ম্ম রক্ষার্থ বহ্নিমুখে জীবন আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন রাজনগর নামে কথিত উক্ত সুখ্যাত স্থানের প্রায় দুই মাইল ব্যবধানে ক্ষেম সহস্র গ্রাম ক্ষেম সহস্রের পশ্চিমাংশে করবংশীয়ের বাস এই করবংশে হরিবল্লভ নামে এক শান্ত সুধীর ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার স্ত্রীর নাম ললিতা দাসী ইঁহাদের তিন পুত্র হয়, যথা—কালিপ্রসাদ, চন্দ্রনাথ ও দুর্গাপ্রসাদ এই সর্ব্বকনিষ্ঠ দুর্গাপ্রসাদই প্রসিদ্ধ "ক্ষেম সহস্রের সাধু"

১৭৭৩ শকাব্দে কার্ত্তিক মাসের একাদশ দিবসে সোমবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

যাঁহারা ভবিষ্যতে কোন মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিখ্যাত হন; যাঁহারা দেশের জন্য,—সমাজের অনুকরণ জন্য, স্বীয় পদচিহ্ন রাখিয়া

যান, তাহার আভাস তাঁহাদের বাল্যকালেই কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি হইয়া থাকে। তাঁহাদের বাল্য খেলায়ও যেন কতকটা বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে।

শিশুবেলায় যখন তিনি পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজন সহ পাড়ায় বেড়াইতে যাইতেন, কোথাও দেবতা দেখিলেই প্রণাম করিতেন বাড়ীতে লক্ষ্মীজনার্দ্দন বিগ্রহ ছিলেন, পিতার অনুসঙ্গে ত্রিবেলাই তিনি দেবতা প্রণাম করিতেন। তাঁহার সাধুত্বের বীজ শিশুবেলা হইতেই, এই বীজ কালে অঙ্কুরিত হইয়া ফলপুষ্প ভারাক্রান্ত হইয়াছিল, এবং পাড়াপ্রতিবাসী ও পার্শ্ববর্ত্তীগণ তাহা আস্বাদনে বিভোর হইয়াছিল

পাঁচ বৎসর অন্তে তঁহার "হাতে খড়ি" হয় তখন গ্রামে গ্রামে স্কুল পাঠশালা ছিল না, গ্রাম্য "গুরু"র গৃহে গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত দুর্গাপ্রসাদও স্বগ্রামে জগন্নাথ ভট্টাচার্য্যের কাছে বিদ্যার্জ্জনের জন্য প্রেরিত হইলেন লেখা পড়ায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল

এই সময়ের একটি কথা বেশ সুন্দর। ইহা একদা তিনি নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন তিনি ছেলেবেলায় বেশ গাছে চড়িতেন একসময় নিজ বাটিকাস্থ এক কাঁঠাল গাছে উঠিয়া একটি পাকা কঁঠাল পাড়িলেন কাঁঠালটি বড় ছিল না পাকা কাঁঠালের লোভ সব শিশু বেশীক্ষণ সম্বরণ করিতে পারে না দুর্গাপ্রসাদও পারিলেন না। নীচে লইয়া আসিবার বিলম্বটুকুও সহিল না, গাছের উপরে বসিয়াই কাঁঠালটি ভাঙ্গিলেন, ও খাইতে ইচ্ছা করিলেন

পীতবর্ণ সুপুষ্ট রসাল কোষ দর্শনে বালকের মনে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের কথা জাগিল যে কোন ভাল বস্তুই তো আগে দেবতাকে দিতে হয়? এ সুন্দর পীত কোষগুলি লক্ষ্মীজনার্দ্দনেরই উপযুক্ত তাঁহাদিগকে অগ্রভাগ না দিয়া তো খাওয়া যায় না? এদিকে কাঁঠাল ভাঙ্গা হইয়াছে, এবং খাইতেও ইচ্ছা। কি করেন? অগত্যা পরিহিত বস্ত্রের এক

প্রান্তে কয়েকটা ভাল কোষ দেবতার জন্য বাঁধিয়া রাখিলেন ও অবশেষে ক্ষুদ্র কাঁঠালটী গাছে বসিয়াই খাইলেন।

কাঁঠাল খাওয়া সমাধা হইলে, বস্ত্রে বাঁধা কাঁঠাল-কোষ কয়েকটি আনিয়া মাকে দিলেন; এবং বলিলেন "মা একটা পাক কাঁঠাল পাইয়াছিলাম, অগ্রভাগ দেবতার জন্য রাখিয়া গাছে বসিয়া কাঁঠালটা খাইয়াছি; এই লও দেবতার ভাগ, দেবতাকে দিও" মা বালকের এই দেবভক্তির পরিচয় পাইয়া সাতিশয় তুষ্টা হইলেন এবং "আচ্ছা দিব" বলিয়া পুত্রের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া তাহা হাতে লইলেন

ভবিষ্যতে যে ভক্তিরসে সহবাসীগণ আপ্লাবিত হইয়াছিল, ছেলে বেলাতেই এইরূপে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল

হরিবল্লভের গৃহের উত্তরেই চরণরাম করের বাড়ী চরণরামের চারি পুত্র; ইহারা কেহ দুর্গাপ্রসাদের সমবয়স্ক কেহ বা বয়োধিক ছিলেন ইহাদের সঙ্গেই খেলা ইত্যাদি করিতেন ও খেলার অনুরোধে তাহাদের গৃহে যাইতেন

চরণরামের চারি পুত্রের মধ্যে নিত্যানন্দকর বয়সে তাঁহার ছোট হইলেও উভয়েই একত্রে পড়িতেন নিত্যানন্দ বলেন, তাঁহারা দুই বৎসর এইরূপে একত্রে পড়িয়াছিলেন তৎপর ওঝা গৃহে যাওয়া কালে একদিন দুর্গাপ্রসাদ তাহাদের বাড়ীতে গমন করেন তাহাদের ঘরে কয়েক খানা পুঁথি ও পুঁথির ছিন্ন পত্র ছিল, তন্মধ্যে একখানা দুর্গাপ্রসাদ হাতে লইলেন ও পাঠ করিতে করিতে তন্ময়চিত্ত হইলেন আর তিনি সেদিন ওঝা গৃহে গেলেন না, ঐ ক্ষুদ্র পুঁথি খানাই বিভোর হইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন পরে দুর্গাপ্রসাদ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন একদিন দুইদিন করিয়া দিন যাইতে লাগিল ওঝা গৃহে যাওয়া বন্ধ হইল, আর সেই ক্ষুদ্রতম পুঁথিই সম্বল হইল; সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ সে ক্ষুদ্রতম পুঁথির পাতা কয়েকটী হাতে

কাহাকেও দেখিতে দেন না, লুকাইয়া রাখেন ও আপন মনে সর্ব্বদা পাঠ করেন। পিতা ওঝা গৃহে পাঠাইতে যত্ন করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। ক্ষুদ্র পুত্র ক্ষুদ্র পুঁথি লইয়া বিভোর লোক এই কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু কেহই দেখিতে কি জানিতে প বিল না যে সে ক্ষুদ্র পুঁথি কি এবং তাহাতেই বা কি লিখিত ছিল

এই পুঁথি খানাতে তিনটি মাত্র পত্র ছিল, তিনটি পত্রই অনেকে দেখিতে পাইয়াছিলেন বর্ত্তমানে অনুসন্ধানেও ঐ পাতাগুলি পাওয়া যায় নাই।

কর্ম্ম।

মানুষ কর্ম্ম সূত্রে বাঁধ , কর্ম্ম অনুসারেই তাহাদের গতাগতি। কাহাকেও আমরা রাজগৃহে রাজপুত্ররূপে জন্মিতে দেখি, কেহ দীনগৃহে জাত হইয়া বাল্যাবধিই দুঃখের পীড়ন সহ্য করিতেছে। কেহ ধনী গৃহে জন্মিয়াও কর্ম্মদোষে পীড়াগ্রস্ত, কেহ দীন সন্তান হইয়াও স্বাস্থ্যসুখে হাস্যময় জীবন অতিবাহিত করিতেছে কেহ না পড়িয়াও প্রখর বুদ্ধিমান, কেহ বিদ্যার্জ্জন করিয়াও নির্ব্বোধ

এ সব ব্যতিক্রম কেন? ইহার মীমাংসা কি? এ সব নিজ কর্ম্মফল ব্যতীত আর কিছুই নহে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই কাহাকে ধনীগৃহে, কাহাকেও বা দীন কুটীরে আনয়ন করিয়াছে। শ্রীভগবান স্বেচ্ছাচারী বা পক্ষপাতী নহেন; পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলেই তুমি সুখী হইয়াছ, আমি দুঃখের জীবন অতিবাহিত করিতেছি, তুমি শিশু হইতেই তীক্ষ্ণ ধীশক্তি-সম্পন্ন, আমি নির্ব্বোধ।

এমন দেখা যায় যে দুজন একটি নূতন ভাষা শিখিতেছে, একজন সহজেই তাহা আয়ত্ত করিতেছে, অপরকে বহু ক্লেশে তাহা শিখিতে হইতেছে এক জনের যেন তাহা পূর্ব্বাধীত, দেখা মাত্রেই স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে, অপরের তাহা নহে ইহাতে কি মনে হয়? মেধা শক্তির কথা বলা যাইতে পারে কিন্তু যদি এ দুজনই সমমেধাবী হয়, তবে আর ইহার সদুত্তর মিলে না ইহার সদুত্তর জন্মান্তর্বাণ অধীত বিদ্যা একজনের স্মৃতি পথারূঢ় হইতেছে বলা যাইতে পারে

দুর্গাপ্রসাদের বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই, গুরুর কাছে মোটে দুইবৎসর যৎসামান্য পড়িয়াছেন, তৎপরে সেই তিনপাত পুঁথি লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন পরবর্ত্তী কালে তাঁহাকে কখন কখন প্রেমানন্দের মনঃশিক্ষা, ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা এবং প্রেমভক্তি চন্দ্রিকাও পাঠ করিতে দেখা যাইত, তদ্ভিন্ন অন্য কোন্ গ্রন্থপত্র তিনি বিশেষ দেখেন নাই, কিন্তু ইহাতেই তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এই বিদ্যাতেই জীবনের কঠিন সমস্যা গুলি মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা কি জন্মান্তরীণ আয়ত্ত জ্ঞানের প্রস্ফূরণ নহে? কে বলিবে নহে?

*   *   *   *   *

গৃহস্থের গ্রাম্য ছেলে; পড়া শুনায় না গেলেও চলিতে পারে—যদি কাজ কর্ম্মে মন দেয়। দুর্গাপ্রসাদ কিন্তু শুধু তিন পাতের পুঁথি লইয়া ব্যস্ত নিজেই পড়েন, নিজেই রস অনুভব করেন ৮।৯ বৎসরের বালক,—একা এক কিরূপে যে ইহাতেই তৃপ্ত থাকেন, বুঝা যায় না বালক স্বভাবে খেলায় রত হইলেও এই নির্দ্দিষ্ট পুঁথি লইয়া সদা ব্যস্ত থাকিতেন। ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয় এবং বোধ হয় উক্ত পুঁথির কোন উদাস উপদেশ বালকের উর্ব্বর মস্তকে বিশেষ কার্য্যকারী হইয়াছিল; বোধ হয় ইহাতে তাঁহার সংসারের ও দেহের অনিত্যতা তখন হইতেই মনে বদ্ধমূল হইয়া

গিয়াছিল কিন্তু গৃহস্থের ছেলের এরূপে দিনপাত চলে না পিতা তাঁহাকে কাজকর্ম্ম শিক্ষা দিতেই মনে করিলেন।

ইহাদের শিক্ষাগত ব্যবসায় বাসনের কাজ ইহারা সকলেই পিত্তল কাঁসা ইত্যাদি ধাতুর বাসন প্রস্তুত করিতে শিক্ষিত হয় ও এই ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে হরিবল্লভও নিজ পুত্রকে তাহা শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

কনিষ্ঠপুত্র পূর্ব্বে পুঁথি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, এক্ষণে পিতৃ আজ্ঞায় কাজকর্ম্মে মনোযোগী হওয়াতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় অতিশয় আনন্দিত হইলেন, তিনিও তাঁহাদের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুইবৎসর অতীত হইল, দুর্গাপ্রসাদ এক্ষণে একাদশ বর্ষীয় বালক কিন্তু এই সময়ে পিতা নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামের লোকেরা নিজে নিজেই সাধারণ রকম ঔষধ পরিচয় ও ঔষধগুণ জ্ঞাত ছিল, গ্রামে অনেকেই ভাল রকম চিকিৎসা জানিত হরিবল্লভেরও ঐরূপ চিকিৎসা হইয়াছিল কিন্তু ফল ভাল দেখা যায় নাই সেই ব্যধিতেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন দুর্গাপ্রসাদ দ্বাদশ বৎসরের বালক।

যথাসম্ভব শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেল। এক্ষণে সংসারের ভার বালকদেরই উপর তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন বালক স্বব্যবসায়ে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জেষ্ঠদ্বয় কনিষ্ঠের এইরূপ কার্য্যতৎপরতা ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এইরূপে তিন বৎসর যাইতে যাইতেই অত্যল্প কিছু সংস্থান করিতে পারিলেন.

এক্ষণে তিনি পঞ্চদশ বর্ষীয় গৃহে মাতা, পিসী ও ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহারা সকলেই এই ক্ষুদ্র বালকের কথায় ও মতে পরিচালিত হইতেন ইঁহার উপরই সংসারের সকল ভার ন্যস্ত হইয়াছিল ভ্রাতৃদ্বয় কনিষ্ঠের

বুদ্ধির প্রখরত দৃষ্টে তাঁহার কথা ছাড়া কিছুই করিতেন না এই সময়ে তিনি জ্যেষ্ঠের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়া স্বয়ংই উদ্যোগী হইলেন ও একপাত্রী স্থির করতঃ জেষ্ঠের বিবাহ দিলেন

এই সময়ে তিনি নিতান্তই কর্ম্মতৎপর হইয়াছিলেন বিলাসিতার নাম গন্ধও তিনি অবগত ছিলেন না কাহারও সহিত কখনও বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই, এবং সামান্যেই সদা সন্তুষ্ট থাকিতেন কিন্তু তাঁহার একাগ্রতা অতি অদ্ভুত, যে কার্য্য ধরিতেন, যত কেন কঠিন হউক না, তাহা সম্পন্ন করিতেন একদা একটা পুষ্করিণী সেচন করিতে ইচ্ছা করিলেন। যেমন ইচ্ছা, তেমনি নিয়োগ। একা পুকুর সেচিতে লাগিলেন, কেন যে সেচিবেন, তাহার দিকে লক্ষ্য নাই, কিন্তু সেচিতে বলিয়াছেন,—সেচিতেই হইবে, তাই সেচিতেছেন।

এক—অনুসঙ্গী বা সাহায্যকারী কেহ নাই সেচিতেছেন প্রভাতে হইতে সেচিতেছেন, মধ্যাহ্ন হইল, ক্ষান্ত হইলেন না সূর্য্যদেব লোহিত-রাগে পশ্চিমকাশ রঞ্জিত করিলেন, সেচন তো আর ক্ষান্ত হয় না, এখনও যে জল রহিয়াছে ? সেচিতেই হইবে, প্রতিজ্ঞা কদাপি অপূর্ণ থাকিবে না; এইরূপে সন্ধ্যা অতীত হইল

পর্ব্বতও অধ্যবসায়ীকে পথ প্রদান করে, জল আর কতক্ষণ থাকিবে ? পুকুর সেচা হইল পুকুরের "মুর" অর্থাৎ তলভাগের মাটি দৃষ্ট হইল ;—দুর্গাপ্রসাদ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সফলতার উৎফুল্ল-তার সহিত গৃহে আসিলেন

এ পুষ্করিণী সিঞ্চন কোন উদ্দেশ্যমূলক নহে, কারণ সিঞ্চনান্তে মৎস্য ধরিয়া গৃহে আনেন নাই এ ঘটনাটি অতি সামান্য সন্দেহ নাই। সামান্য হইলেও—খেয়াল বশের ঘটনা বিশেষ হইলেও, উহা তাঁহার কার্য্যে একাগ্রতা ও দৃঢ়নিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

———()———

দীক্ষা ও শিক্ষা।

বনভাগ পরগণার অধীন বিষ্ণুপুর গ্রামে বৈষ্ণবরায় বংশীয় বৈষ্ণব-গোস্বামীগণের বাস। বৈষ্ণবরায় সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন, তাঁহা হইতেই এবংশের খ্যাতি প্রতিপত্তি ও গোস্বামীপদবী লাভ

ক্ষেম সংগ্রেব কর বংশীয়গণ বিষ্ণুপুরের গোস্বামীগণের শিষ্য। দুর্গাপ্রসাদের বয়স যখন ষোড়শ অতিক্রম করে নাই, তৎকালে তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের অভিলাষ জন্মিল।

বৈষ্ণবের সন্তান বাল্যাবধিই জানে যে দীক্ষা ব্যতীত কোনরূপ আরাধনাই ফলপ্রদ হয় না দুর্গাপ্রসাদ স্বতঃই দীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছা করিবেন, বিচিত্র নহে তিনি প্রায় একদিনের পথ বিষ্ণুপুর হইতে, কৌলিক গুরু বংশীয় শ্রীমৎ রাসবিহারী গোস্বামীকে গৃহে আনিয়া যথা-শাস্ত্র দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেন

দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহার জীবন যেন এক নূতন পথে চলিল তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মানুমত বৈদিকাঙ্গ সাধনে বিশেষ তৎপর হইলেন। আমিষ ভক্ষণ বর্জ্জন করিলেন, একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তিথি বিশেষে উপোষণ, দেব-গৃহ মার্জ্জন এবং যথাকালে সন্ধ্যাকৃত্যাদি করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে প্রায় চারি বৎসর অতীত হইল, দুর্গাপ্রসাদ ঊনবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই সময় তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব খুব প্রবল, কিন্তু তিনি তাহা এরূপ ঢাকিয়া রাখিতেন যে কেহ ঘুর্ণাক্ষরেও তাহা বুঝিতে পারিত না

গুরুদেব যে মন্ত্রধ্যানাদি অর্পণ করিয়াছেন, তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়োজন; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও তাহ জিজ্ঞাস করেন না; যেখানে হরিকথা,, উৎকর্ণ হইয় সেখানে গিয়া তাহা শুনিতেন।

যেখানে সংকীর্ত্তন, যে কোনরূপেই হউক, তথায় গিয়া তাহাতে যোগ দিতেন। তাঁহার সহপাঠী নিত্যানন্দের কথা বলিয়াছি, ইহাদের সঙ্গে অনেকদিন বাল্য খেলা খেলিয়াছেন; ইহাদের বাড়ী হইয়া গুরুগৃহে যাইতেন এবং ইহাদের গৃহেই তাঁহার পথ প্রদর্শক সেই তিন পাতের পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল

নিত্যানন্দের মাতা একজন আদর্শ গৃহিনী ছিলেন। স্বামীর প্রতি তাঁহার একনিষ্ঠা প্রশংসনীয় ছিল এই সাধ্বী ও তাঁহার পতি একত্রে কখন কখন ধর্ম্মবিষয়ে নানারূপ কথোপকথন করিতেন দুর্গাপ্রসাদ অনেকদিন এইরূপ কথা শুনিয়াছেন, পতি পত্নীর এইরূপ ধর্ম্মালাপ তাঁহার ভাল লাগিত এবং তিনি প্রায়শঃ তথায় যাইতেন

নিত্যানন্দ জননীর হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের ন্যায় শারীরিক সৌন্দর্য্যও যথেষ্ট ছিল তাঁহার গুণে, মাতৃ বয়স্কা এই বর্ষিয়সী রমণীকে দুর্গাপ্রসাদ মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন তাঁহার একনিষ্ঠা এবং কোন কোন কথা তদীয় জীবনে যেন নূতন আলোক আনয়ন করিয়া দিয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষার আবশ্যকতার একান্ত অনুভব সম্ভবতঃ ইহাঁদের বাক্য শ্রবণেই হইয়া থাকিবে

বাল্যাবধিই যিনি এক অজ্ঞাত বংশীধ্বনী শ্রবণে আকৃষ্ট, সেই বংশী নাদের তানে তানে যিনি নৃত্য করিয়াছেন, নবোত্থিত সে স্বরলহরী তাঁহার চিত্তে কিরূপ প্রতিক্রিয়া করিয়াছিল তাহা তুমি আমি কি বুঝিব? এইভাব মনে হওয়া মাত্রই তিনি মনের অন্ধকার দূর করিবার জন্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এক বৎসর এইরূপ স্থানে স্থানে সুপাত্রের অন্বেষণ করিলেন অনুরাগী ভক্ত যার তার কাছেই নিজ ইষ্ট সিদ্ধির অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন, হায়। কেহই তাঁহাকে ইষ্টবার্ত্তা বলিতে পারিল না, কেহই মনের আঁধার ঘুচাইতে সমর্থ হইল না ভক্ত নিরাশচিত্তে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

স্থির সাগরে তরঙ্গপাত হয়, দেখিতে বড়ই সুন্দর। বিমলচিত্তে ভাবতরঙ্গ খেলে ইহাও দেখিতে বড়ই মনোরম নিরাশ হইয়া দুর্গাপ্রসাদ ভাবিলেন,—"গুরু কে?"—"যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।"—"যদি গুরু হরি, তবে অসাধনে তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যাইবে? দেখিলেও তাঁহাকে পাইব না হয়তঃ দেখিয়াছি, চিনি নাই জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত না হইলে—দিব্যনেত্রে না দেখিলে তো তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় না? অতএব সাধন চাই

সাধন চাই—সাধন করিব, তবেই তাঁহাকে ধরিব কিন্তু কি সাধন করিব? সাধন তো তিনিই শিখাইবেন এক্ষণে আমার গুরুদত্ত নামই সম্বল। শুনিয়াছি, কলিতে, নামই পরম সাধন।* শুনিয়াছি, সত্যযুগে ধ্যান ধারণাদি তপঃ প্রভাবে যাহা হইত, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদানাদিতে যে ফল ফলিত, দ্বাপরে ভগবৎ সেবা দ্বারা যে সম্পদ প্রাপ্তি ঘটিত, কলিতে শুধু নামকীর্ত্তন দ্বারা তাহা হইয়া থাকে † অতএব নাম বিনে সাধন নাই, নামাশ্রয় বিনে সংসার সাগরে ভাসমান দিশাহারা অক্ষম জীবের আর গত্যন্তর নাই।"

এইরূপ ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি নাম সাধনে রত হইলেন মালায় সংখ্যা করিয়া নাম লইতে লাগিলেন।

নামের অচিন্ত্যশক্তি; সেই শক্তির প্রত্যক্ষ ফল লক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল কিছুদিন মধ্যেই দুর্গাপ্রসাদের চিত্ত প্রসন্ন হইল, দিব্য নেত্র প্রস্ফুটিত হইল, প্রথমেই তিনি স্বাভীষ্ট বস্তু চিনিয়া নিতে সমর্থ হইলেন

* "ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌগোবিন্দ কীর্ত্তনাৎ।"

বিষ্ণুরহস্যে

† "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ "

শ্রীভাগবতে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে সাধকের পৈতৃক গুপ্তধন প্রাপ্তির একটা কথা আছে গুপ্তধন সবারই কাছে আছে কিন্তু চক্ষু না থাকিলে তাহা চিনিয়া লওয়া যায় না

কস্তুরিকা মৃগের নাভিমূলেই কস্তুরী থাকে, কিন্তু সে তাহার গন্ধে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হয়। মৃগের জ্ঞান নাই, তাই সে বৃথা দৌড় দৌড়ি করিয়া প্রাণ হারায় ভক্তি প্রভাবে প্রজ্ঞাবান, নাম প্রভাবে চক্ষুষ্মান নবীন সাধক জানিলেন যে গৃহের কোণে ধন খুঁজিয়া তিনি বৃথা দিগন্তে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষাগুরু তাঁহারই গৃহপার্শ্বে তিনি আর কেহই নহেন—তিনি তাঁহার সতীর্থ নিত্যানন্দের জননী, তাঁহার মাতৃতুল্যা বর্ষীয়সী মনোমোহিনী

মনোমোহিনীর ব্যবহার মনোমোহিনীর বাক্যই তাঁহার জীবনতরি পরিচালন পক্ষে ধ্রুবতারা তিনি কতস্থানে গমন করিয়াছেন, কত সাধুর বাক্য সুধা শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু মনোমোহিনীর ব্যবহার—মনোমোহিনীর বাক্য তাঁহাকে যেরূপ উদ্ভ্রান্ত করিয়াছে, যেরূপ তাঁহার চিত্তে লাগিয়া রহিয়াছে, এমন আর কোথায়ও হয় নাই মনোমোহিনীর ব্যবহারে কপটভাব লেশও নাই তাঁহার বাক্য সরল—মর্ম্মস্পর্শী—অনাবিল

সংস্কৃত শ্লোকের ঝঙ্কার না থাকিলেও -যুক্তি তর্কের ঝঞ্ঝারাগ বিরহিত হইলেও, তাহাই ঠিক, তাহাই যথার্থ ; তাহাই হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহা যেন শ্যামের বাঁশরী, তাহাতে যথার্থই বাউরী করিয়া তুলে

দুর্গাপ্রসাদ নিজ শিক্ষাগুরু চিনিয়া লইলেন তিনি তৃপ্ত হইলেন, কৃতার্থ হইলেন

সাধন সংগুপ্তি।

দুর্গাপ্রসাদের শিক্ষাগুরু নিরূপিত হইলে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন মনোমোহিনীর কোন্ ব্যবহার কি বাক্য তাঁহার প্রাণে অমৃত প্রবাহ ছুটাইয়া দিয়াছিল, তাহার প্রকাশ নাই একথা দুর্গাপ্রসাদকেও কেহ জানিতে পারে নাই এমন কি, যাঁহাকে তিনি শিক্ষাগুরুর উচ্চ আসনে উপবেশিত করেন, স্বয়ং তিনি বলিয়াই যাঁহার চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করেন, সেই মনোমোহিনীই জানিতে পারেন নাই —জানিতে পারেন নাই যে, দুর্গাপ্রসাদ তাঁহাকে নিজ শিক্ষাগুরুর আসনে স্থাপিত করিয় ভজনমার্গে প্রবেশের উপায় বিধান করিয়াছেন।

একটা কথা এস্থলে বলা আবশ্যক কাল বশে নানা উপধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, বৈষ্ণব ধর্ম্মের রস সংগ্রহ করিয়া জীবিত আছে পরগাছা যেমন বৃক্ষান্তর আশ্রয়ে পুষ্ট হইতে থাকে, এই উপধর্ম্ম গুলিও তদ্রূপই আশ্রয়-বৃক্ষরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্মকে আবৃত করিতেছে, এইসব উপধর্ম্মের মধ্যে এদেশে সহজিয়া বা কিশোরীভজন মত বিশেষ প্রবল ইহারা স্ত্রীপুরুষে এক সহযোগে স্বমতপোষক ধর্ম্মাচরণ করেন; প্রত্যেকেই স্বাশ্রিত কোন রমণীকে শিক্ষাগুরুরূপে অবধারণ করেন। সে রমণীও পক্ষান্তরে সেই পুরুষকেই স্বীয় আশ্রয় গুরুরূপে গণ্য করেন।কিন্তু এরূপ বিধান গোস্বামী-শাস্ত্র সম্মত নহে; তাই এইরূপ মত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনাদৃত

আমাদের নবীন সাধক দুর্গাপ্রসাদের শিক্ষাগুরু গ্রহণ এই জাতীয় ছিল না,—মনোমোহিনীর ব্যবহার বা বাক্য-বিশেষ তাঁহার জীবনতরি চালাইবার যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি তাঁহাকে গুরুর উচ্চাসনে

উপস্থাপিত করেন, একমাত্র সেই ব্যবহার বা বাক্যের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল, মনোমোহিনীর বাহ্য ব্যবহারের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য মাত্র ছিল না।

ধর্ম্মজগতে মনোমোহিনী তাহা হইতে অতি নিম্নে ছিলেন। মৃণ্ময় জড়প্রতিমা পূজাতেও সাধক চিন্ময় ভগবতত্ত্বের সান্নিধ্য সিদ্ধিলাভে যেমন সমর্থ হন, মনোভীষ্ট কোন ব্যক্তিতে সৎ চিৎ-আনন্দময় গুরুবুদ্ধি উপজাত হইলে, তদ্রূপেই ঐ নবদেহধারীকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলে, সেই গুরুরূপীর বাহ্যব্যবহার যেরূপই হউক শিষ্য স্বীয় মনোভাবের প্রসাদে তেমনই সিদ্ধিলাভে কৃতার্থ হইতে পারেন। আমাদের এই প্রস্তাবিত গুরুশিষ্যের আচরণে তাহারই উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইহাঁদের ব্যবহারে আরও শিক্ষালাভ হয়। ভাবের গাঢ়তায় ভাবানুরূপ লাভ ঘটে, না ঘটিয়া পারে না। যদি শিষ্যের চিত্ত নির্ম্মল হয়—যদি তাহা জগতের আবিলতা স্পর্শ-শূন্য হয়, যদি সাধনের অনুরোধেই তাহার সাধন বা সমগ্রচেষ্টা নিয়োজিত থাকে,—যদি তাহা কলুষিত কামনা দুষ্ট না হয়, তবে গুরু যে প্রকৃতিরই হউন না শিষ্যের তাহাতে কোন প্রত্যবায় ঘটে না, তাহার সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য। গুরু স্ত্রী অথবা পুরুষ দেহধারী, যাহাই হউন না কেন, তাহাতে কোন প্রত্যবায় হয় না। ভাব প্রভাবে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

মনোমোহিনীর চারি পুত্রের দুই জনই দুর্গাপ্রসাদাপেক্ষা বয়োধিক, মনোমোহিনী দুর্গাপ্রসাদের মাতৃবয়স্ক। এই প্রবীণা শুদ্ধমতি রমণীর প্রতি তাঁহার গুরুভক্তি উপজাত হওয়া অস্বাভাবিক হয় নাই। এই গুরুর আশ্রয়েই তিনি সাধনায় সফলমনোরথ হইতে সমর্থ হন। সাধনের সফলতাতেই ইহার স্বাভাবিকতার প্রমাণ হয়।

নবীন সাধক মনে মনেই একথা রাখিলেন। মনোমন্দিরে মনে-

মোহিনীর পবিত্র মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া মানস-কুসুমে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন একথা কেহ জানিল না বুঝিল না তবে তদবধি যে কোন উপলক্ষেই হউক, একবার কবির গুরু দর্শন করিয়া আসিতেন কাজ কর্ম্ম সমভাবেই চলিতে লাগিল। বাহ্যিক কাজ কর্ম্ম সাধককে কদাপি বাধা দান করিতে পারে না।

শ্রীরূপ সনাতন রাজমন্ত্রী ছিলেন, ইহাঁরা শ্রীমহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া তাঁহার কাছে পত্রী প্রেরণ করিতেন অবশেষে প্রভু উত্তররূপে শ্রীমহাপ্রভু হইতে তাঁহারা একটি শ্লোক প্রাপ্ত হন, শ্লোকের অর্থ এই যে,—পরব্যসনিনী নারী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও অন্তরে কান্ত সম্মিলন সুখ অনুভব করিয়া থাকে।

এই শ্লোক প্রাপ্তে শ্রীরূপ সনাতন বাহ্যে কাজ কর্ম্মে পূর্ব্ববৎ গাঢ় নিবিষ্ট হন কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমরস-সাগরে সুখে সদাই তাঁহারা নিমগ্ন থাকিতেন

যিনি যত সুচতুর সাধক, তিনিই নিজ অন্তর্নিহিত ভাবরাশি তত গোপনে রাখিতে সমর্থ সাধকের সাধনমন্ত্র তো আর হাটে বিকাইবার দ্রব্য নহে ইহ লোকচক্ষুর অন্তরালেই শোভে ভাল,—ফুটে ভাল ধর্ম্ম ধন পরকালের সম্বল,—ইহা তো আর জগতের বাহবা লইবার জন্য নহে যে তাহা প্রকাশের আবশ্যক ; ধর্ম্ম জাহির করে যাহারা, তাহারা চতুর সাধক নহে, সাধন মার্গে তাহারা স্থূলবুদ্ধি, তাহাদের গুণ জাহিরের ঢক্কারবে তাহাদের "পীরাকি জারিতে" তাহাদের সাধনের বল ক্ষয় হইয়া যায়। তাহারা ধর্ম্মজগতে কোন উন্নতি করিতে সমর্থ হয় না শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ জল সিঞ্চন দ্বারা তাহাদের মূল ধর্ম্মতরু বিবর্দ্ধিত না হইয়া, যশোলাভাদিরূপ উপশাখাই মাত্র বর্দ্ধিত হয় যদি তুমি অমৃত ফলের বল্কল লইয়াই তুষ্ট হইয়া রহিলে, তবে আর ফলের মিষ্ট রসের স্বাদ পাইবে কিরূপে ?

দুর্গাপ্রসাদ চতুর সাধক। তিনি নাম জাহিরের পন্থা ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার প্রকৃতিই অন্যরূপ ছিল। তাঁহার স্বভাবই তাঁহাকে নিরিবিলি রাখিয়া দিল, তিনি মনের ভাব গোপনে বিশেষ চেষ্টা পাইলেন।

তাঁহার ভ্রাতৃগণ বা পাড়াপ্রতিবেশী কেহই যেন তাঁহার মনোভাব বুঝিতে না পারে, এই জন্য তিনি দ্বিগুণ উদ্যমে কাজ কর্ম্মে ব্রত হইলেন। এই সময়ে নিকটবর্ত্তী বালাগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে গিয়া কোন কোন ব্যবসায়ীর আশ্রয়ে কাজকর্ম্মে নিযুক্ত হন। ব্যবসায়ীরা তাঁহার অকৃত্রিম আন্তরিকতা সহকৃত কার্য্য দর্শনে আনন্দিত হয়। কিন্তু যিনি বিশাল ভাবরাশি হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন, এ ক্ষুদ্রতম গণ্ডীতে তাহা আবদ্ধ হইবার নহে। কয়েকটা দিন স্থানান্তরে অবস্থানের পরেই আর তথায় থাকেন নাই। সাংসারিক চাতুর্য্য ও সাধনের প্রতিকূল আচার ব্যবহার তাঁহার অসহ্য হওয়ায় কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই তিনি চলিয়া আসেন ও বাড়ীতে থাকিয়া ভ্রাতৃদের সহ স্বয়ংই ধানের ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

ব্যবসায়ে এইরূপে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার আত্মগোপন পক্ষে বিশেষ কার্য্যকারী হয়। তিনি বলিয়াছেন যে, এইরূপে ব্যবসায়ে ব্রত হইয়া তিনি রাতদিন নাম লইতে সুবিধা পাইয়াছিলেন।

বলা গিয়াছে যে, গুরু পরিচয়ের সহজুদ্দেশ্যে তিনি নামাশয় করেন। শাস্ত্রে দেখা যায় যে নিরপরাধে নাম লইতে পারিলে নাম কৃপা করিয়া থাকেন। দুর্গাপ্রসাদ যে উদ্দেশ্যেই নাম করুন না, তিনি সম্ভবতঃ অপরাধশূন্য হইয়াই নাম করিয়াছিলেন, তাই তৎপ্রতি নামের কৃপা হয়। এবং এই জন্যই নাম তাঁহার মনে লাগিয়া রহিয়াছিল, এ নাম আর তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। নামের প্রতি তাঁহার প্রবল আশক্তি জন্মিয়াছিল, তাই একমাত্র হরি নামই তিনি সম্বল করিয়াছিলেন।

দুর্গাপ্রসাদ হাতুড়ী দ্বারা কাঁসা পিটিতেন, আর মনে নাম লইতেন ঠিক যেন কুলটা রমণী গৃহ কার্য্যে ব্যস্ত, কিন্তু অন্তরে কান্ত চিন্তা। শ্রীরূপসনাতনের প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর যে উপদেশ ছিল, দুর্গাপ্রসাদ তাহা এইরূপে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন

——o——

নামতত্ত্ব।

নামের—শ্রীতত্ত্ব নামের মহীয়সী শক্তি। নামের শক্তির নিকট সমস্তই পরাভূত নামের সমকক্ষ আর কিছুই নাই শাস্ত্র বলেন যে নাম শ্রবণ মাত্র সর্ব্বপ্রকার মহাপাতক বিনষ্ট হয় *। তাই বলি নামের সমকক্ষ আর কিছুই নাই নাম স্বয়ং হরি স্বরূপ।

সত্যভামা একদা তুলাপুরুষ-দান আরম্ভ করিয়া বড়ই বিপন্ন হইয়াছিলেন। পুরুষের তুল্য পরিমিত ধনরত্ন দানই তুলাপুরুষ দান বলিয়া খ্যাত সত্যভামা তৌল যন্ত্রের একদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও অপর দিকে যাবতায় ধনরত্ন রাখিলেন কিন্তু ওজন ঠিক হয় না, সত্যা দান করিতেও পারেন না শেষে নারদের উপদেশে একটি তুলসীদলে কৃষ্ণ নাম লিখিয়া তৌল যন্ত্রে স্থাপন করিলেন, আর যন্ত্রের উভয়দিক সমান হইয়া গেল কৃষ্ণ একদিকে আর কৃষ্ণনামাঙ্কিত তুলসীদল অন্যদিকে, উভয়দিক সমান। দেখা গেল কৃষ্ণ ও তাঁহার নাম সমতুল্য

* "যন্নাম শ্রবণেনাপি মহাপাতকিনোপি যে
পাবনত্বং প্রপদ্যন্তে কথং স্তোষ্যামি ক্ষুদ্রধীঃ"
বৃহন্নারদীয় পুরাণে।

যথা শাস্ত্রে :—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোভিন্নাত্মানাম নামিনোঃ"

নাম ও নামীতে ভেদ নাই ভগবানের নামে ও স্বরূপে অভেদ অতএব নাম অনন্ত ঐশ্বর্য্যময়, অনন্ত রসমাধুর্য্যময়, এবং অনন্ত শক্তি সমন্বিত শ্রীভগবানের সমস্ত গুণ ও শক্তি তাঁহার নামে সমাবিষ্ট

ভগবানের নামতত্ত্ব ছাড়িয়া সাধারণ নামের গুণই বিবেচনা কর, একটা শক্তি যে কোন নামেই আছে দেখিবে নামীর গুণ যেন নাম কিয়ৎ পরিমাণে বহন করে সর্প অথবা ব্যাঘ্র, শুধু এ দুটি মনে হইলেই কতকটা যেন ভয়সূচক ভাবোদয় হয় এইরূপ পেতাম্বিত ভূম্যধিকারী বা রাজার নাম মহিমায় কত অশিষ্ট ব্যক্তিকে কর্ত্তব্য পরায়ণ হইতে দেখা গিয়াছে সাধু মহাত্মাদের নাম স্মরণে মনে কেমন এক শান্তিরসের উদয় হয়, ইহা সুপরিজ্ঞাত সংবাদ

আমরা দেহধারী জীব, আমাদের নাম ও দেহ পৃথক আমাদের নাম শব্দময়, শব্দ রূপাদি বিহীন অদৃশ্য দেহ জড়ময়, জড়াণু রূপাদি যুক্ত দৃশ্য আমাদের নাম ও নামীতে কাজেই ভেদ স্পষ্টতর কিন্তু ভগবদ্দেহ সচ্চিদানন্দময়, * নিত্য শাশ্বত, † সেই নির্দোষ, পূর্ণ ও আত্মতন্ত্র ভগবদ্দেহ যেমন রূপগুণাদিবিহীন, ‡ তাহার নামও

* "ইদং শরীরং পরমং মনোজ্ঞং, সচ্চিদানন্দময়ংমমৈব
জানীত যূয়ং নহি কিঞ্চিদন্য, দ্বিনাস্তি ভূয়োসইতীদমূচে"
শ্রীচৈতন্যচরিতে শ্রীভগবদ্বাক্যং

† "সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহতস্য পরাত্মণঃ"
বরাহপুরাণে

‡ "নির্দ্দোষপূর্ণোঃ গুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্র
নিশ্চেতনাত্মক শরীর গুণৈশ্চহীনঃ"
নারদপঞ্চরাত্রে

তদ্রূপই গুণাতীত এবং অনন্ত শক্তিময়, অতএব ভগবদ্দেহ ও তদীয় নামে কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ নাই; তাই "অভেদ নাম নামিনোঃ।"

অতএব কলিতে যখন আমাদের ধ্যান ধারণার শক্তি নাই যজ্ঞ অর্চ্চনার সামর্থ্য নাই, তখন নামই একমাত্র অবলম্বনীয় নামের অপার শক্তিতে কলিহত জীবের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে, সন্দেহ নাই।

তবে নিরপরাধে নাম গ্রহণ আবশ্যক নামে অপরাধ জন্মিলে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবার পন্থা নাই *

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দুর্গাপ্রসাদ সম্ভবতঃ নিরপরাধে নাম লইয়াছিলেন, তাই নাম তাঁহার মনে লাগিয়া রহিয়াছিল কিন্তু নামে আবার অপরাধ কি?

কে না নাম করে? ভগবানের নাম কে না করে? কিন্তু সর্ব্বত্র তো নামের ফল পরিলক্ষিত হয় না? দেখা যায়, কত ব্যক্তির হাতে নামের মালা, মুখে মিথ্যা বলা। ইহা তো নামের ফল নহে? নামাশ্রয় কারীর শুদ্ধ চিত্তে জঞ্জালরাশি স্থান পাইবে কেন? বুঝিতে হইবে, নাম ইহাকে স্বীয় অনন্ত ফলে বঞ্চিত রাখিয়াছেন কারণ আর কিছু নহে, নিরপরাধে নাম লওয়া হয় নাই, ইহাই কারণ, অতএব অপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ চিত্তে নাম গ্রহণ আবশ্যক

নামাপরাধ কি? শাস্ত্রে দেখা যায় যে, নামাপরাধ দশটি ঃ—

(১) সৎ সকলের নিন্দা (সতাং নিন্দা)
(২) বিষ্ণুনাম হইতে পৃথকভাবে শিবনামাদি কীর্ত্তন
(৩) গুরোরবজ্ঞা
(৪) বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র নিন্দা

* "নাম্নোহি সর্ব্বসুহৃদোহপরাধাৎ পতত্যধঃ"
পদ্মপুরাণে

(৫) নাম মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস

(৬) প্রকারান্তরে নামের অর্থ কল্পনা (নামে অর্থবাদ)

(৭) অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত নামের তুল্যতা চিন্তন

(৮) নাম বলে পাপ কর

(৯) শ্রদ্ধা বিহীনকে নামোপদেশ দান

(১০) নাম মাহাত্ম্যে অপ্রীতি

একটু বিস্তার করিয়া বলিতেছি

প্রথম সাধুনিন্দা নামাপরাধ বলিয়া গণ্য নাম আর বিগ্রহে অভেদ বিধায় নাম কৃষ্ণ স্বরূপ, ইহা বলা গিয়াছে নাম সাধক আর বিগ্রহার্চ্চক, উভয়েই এক কার্য্য করিতেছেন। ভক্তের হৃদয়ে হরি বিরাজিত ; অতএব সাধুভক্ত আর ভগবানে ভেদরহিত, কাজেই সাধুনিন্দা প্রকারান্তরে ভগবানেরই নিন্দা নাম ও বিগ্রহে অভেদত্ব হেতু সাধুনিন্দা নামেরই নিন্দা হইয়া পড়ে, তাই ইহা নামাপরাধ

দ্বিতীয় হরি নাম হইতে পৃথকভাবে শিবাদির * নাম কীর্ত্তনে বহু ঈশ্বরবাদ হইয়া দাঁড়ায় এবং ভগবানে ঐকান্তিকভাব বা একনিষ্ঠার হানি জন্মে হরিই সর্ব্বেশ্বর, অন্য দেবাদি তাঁহারই বিভূতি মাত্র এইরূপ অভেদ জ্ঞানে সর্ব্বত্রই ভগবানকে উপলব্ধি করিবে অন্য নামাদি পৃথকভাবে চিন্তনে প্রকারান্তরে ভগবন্নামে ন্যূনতা কল্পনা হয় তাহা কাজেই নামাপরাধ

তৃতীয় ভগবন্নাম মন্ত্রের উপদেষ্টা ও শিক্ষাদাতা (গুরু) পরম সুহৃদ এই অপ্রাকৃত চিন্তামণি নামতত্ত্ব স্বয়ং তিনি,—সেই নামী

---

* যাহারা শৈব বা শাক্ত স্ব স্ব ইষ্টদেবের নামই তাহাদের কাছে ভগবন্নাম স্বরূপ (Name of Supreme God) ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষেও এইরূপ

ব্যতীত আর কে এ তত্ত্ব জানিবে? অতএব গুরুই সেই নামী বস্তুতঃ ভগবন্নামে ভক্তি থাকিলে তদুপদেষ্ট শিক্ষাদাতার প্রতি ভক্তি না হইয়া পারে না নাম ও নামী অভেদ, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা কার্য্যতঃ নামের প্রতিই অবজ্ঞা বলিয়া ইহা নামাপরাধ।

চতুর্থ ভগবৎ বাক্যই বেদ বেদ ও বেদানুগত গীতা ভাগবতাদি সাত্ত্বিক শাস্ত্র সকল প্রতিপাদক নামব্রহ্মের মাহাত্ম্যই ঐ সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় তদসম্মানে ভগবদ্বাক্যের প্রতি অপ্রীতি ও তাহাতে চিত্ত অবিশ্বাস রূপ মলিনত্বের আশ্রয়ীভূত হয়, তাহা সাধন ও ভক্তির একান্ত বাধক, অতএই ইহা নামাপরাধ

পঞ্চম—নাম ও নামী যখন অভেদ তখন নামের মহিমা বর্ণনা করিতে কে সমর্থ হইবে? শাস্ত্রে নাম মাহাত্ম্য যৎকিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাতে যাহার বিশ্বাস নাই, নামে তাহার কদাপি শ্রদ্ধা হইতে পারে না। নাম মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস আর ভগবানকে না মানা এক কথা মাত্র সুতরাং ইহা এক নামাপরাধ

ষষ্ঠ—ভগবান নাম রূপাদি বিহীন নির্গুণ। হরি কৃষ্ণাদি নাম কল্পিত ইত্যাদি প্রকল্পন অথবা নামে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রজল্পন দ্বারা ভগবানের সচ্চিদানন্দঘন চিন্ময় বিগ্রহে অবিশ্বাস প্রযুক্ত ভক্তি বীজ হৃদয় হইতে উন্মূলিত হয়, অতএব ইহা একটী নামাপরাধ

সপ্তম যজ্ঞ ব্রতাদি অতি পুণ্যজনক শুভ ব্যাপার বটে, কিন্তু ইহা জড়ধর্ম্মান্তর্গত কর্ম্ম মাত্র কর্ম্মক্ষয়কর অপ্রাকৃত নামের সহিত ইহাদের তুলনায় নামের মাহাত্ম্যে খর্ব্বতা হয়, "উপকার কিছুই নাই", তাই ইহা একটী নামাপরাধ।

অষ্টম—নামের অসীম ফলের কথা শুনিয়া যদি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ মনে হয় যে, পাপ করিলে আর কি হইবে, পাপ করিয়া নাম করিয়া

লইব, তাহাতেই পাপ আর কিছুই করিতে পারিবে না, এই জ্ঞানে নাম করা পাপ কার্য্যেরই প্রণোদক হওয়ায় ইহা একটী নামাপরাধ

নবম—জগন্মঙ্গল নামের মাহাত্ম্য জানিয়া যে অশ্রদ্ধা করে, তাহাকে নামোপদেশ দানে সর্পকে দুগ্ধ পান করাইয়া বিষবর্দ্ধনের ন্যায়ই হয়, কারণ সুধামধুর নাম তাহার উপহাসের বিষয় হইয়া থাকে; পরন্তু জানিয়া শুনিয়া শ্রদ্ধাহীনকে নামোপদেশ দানে প্রকারান্তরে নাম নিন্দার সহায়তাই করা হয়, অতএব ইহা একটী নামাপরাধ

দশম—নাম মাহাত্ম্যে অপ্রীতিতে হরি নামেই অপ্রীতি ও অবহেলা জন্মে হরি নামে, অপ্রীতি আর হরির প্রতি অপ্রীতি এক কথা, কারণ "অভেদো নাম নামিনোঃ" অতএব ইহা একটী নামাপরাধ

এই দশবিধ অপরাধশূন্য হইয়া নাম লইলেই নামের প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে নামের ফল পাওয়া আর শ্রীভগবানের কৃপা ফল প্রাপ্ত হওয়া একই কথা এইরূপে নাম লইলে দেখা যাইবে, প্রথমেই সাধকের চিত্ত নির্ম্মল হইবে, সংসারের মহাদাবাগ্নি তাহাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইবে; মূর্খ হইলেও দিব্যজ্ঞান প্রভাবে সে বিদ্যাবধূর জীবন স্বরূপ হইবে, তাঁহার সর্ব্বানর্থ নষ্ট হইবে, অন্তরের তাপ বিদূরীত হইয়া যাইবে ও সে প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইবে *

আহা! শ্রীভগবন্নামের কি মহিমা, আর আহা, আমাদেরই কি দুর্দ্দৈব যে এহেন সুস্বাদু নামে অনুরাগ জন্মিতেছে না

---

* শ্রীমহাপ্রভুকৃত শ্লোক :—
চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয় কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং"
পদ্যাবল্যাং

সাধন কণ্টক

দিন যায় বসিয়া থাকে না, লোকও জীবন পথে অগ্রসর হয়,—জানিয়াই হউক বা অজ্ঞাত ভাবেই হউক ; প্রতিই জগতের ধর্ম্ম দুর্গাপ্রসাদও অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু বড়ই সন্তর্পণে, বড়ই সাবধানে

বলিয়াছি তিনি নিজ বাড়ীতেই কর্ম্মস্থান নির্ব্বাচন করেন তাঁহার সাংসারিক কার্য্যানুরাগ দর্শনে ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার উপরে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন ; কনিষ্ঠই যেন বাড়ীর কর্ত্তা

কর্ত্তা বাহিরে যাহাই থাকুন, অন্তর সদা সজাগ ; তিনি মুহূর্ত্ত তরেও নিজ কর্ত্তব্য ভুলেন নাই এ কর্ম্ম তাঁহার সাধনের সহায়তার জন্যই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন আরও আছে, তিনি বলিতেন, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেই আসা যখন, তখন প্রত্যেকেরই খুব কর্ম্ম করা চাই, কর্ম্ম না করিলে আর কর্ম্ম ক্ষয় হয় না, কর্ম্ম ক্ষয় নহিলে বন্ধন ছিঁড়ে না কর্ম্মসূত্রের বন্ধন বড় শক্ত বন্ধন, ছিন্ন না হইলে জন্ম জন্ম ইহার আকর্ষণে আসিতে হইবে—খাটিতে হইবে। যদি তাহাই, তবে যত সাধ্য, কর্ম্ম করা চাই, করিলেই ক্ষয় হইবে সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় হইলে এবং নূতন কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ না হইলেই আমাদের যাতায়াত দূর হইল, ইহাই কর্ম্মমুক্তি

দুর্গাপ্রসাদ খুব তেজে কর্ম্মে ব্রত হইলেন কর্ম্ম করেন, আর মনে মনে নাম করেন ; দৈনিক গুরুদর্শন করেন। ইহাই তাঁহার সাধন গৃহে লক্ষ্মীজনার্দ্দন আছেন। লক্ষ্মীজনার্দ্দনের পূজার জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন পূজা সুন্দররূপেই হয়

নাম করেন, একাদশী ইত্যাদি করেন, কিন্তু কই মনের মলা তো দূর হইল না ? সাধনের ফল তো সাধক প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন না ? ফল চাই হাতে হাতে পশ্চাৎ ফল পাইবার সংশয়াত্মক আশায় চতুর জন অল্পই ভরসা করেন দুর্গাপ্রসাদও তাহাতে তুষ্ট হইলেন না

ভাবিলেন, দিবারাত্র অবিচ্ছেদে নাম গ্রহণ চাই যেরূপে চিত্ত প্রসন্ন হয়, যেরূপে দেহের বিকার দূর হয়, কাম ক্রোধাদি যেরূপে দূর হয়, তাহাই কর্ত্তব্য

আবার যাঁহার গুরু গৃহ পার্শ্বে, যে ভাবে তাঁহার গুরুসেবা কর্ত্তব্য, তদ্রূপ গুরুসেবা করা চাই কিন্তু দেহে বিকার থাকিতে তো এই গুরুপার্শ্বে যাইবার অধিকার নাই ? বাহ্যত তাঁহার গুরু স্ত্রীদেহধারী ; বাহ্যদৃষ্টি থাকা পর্য্যন্ত, দেহে কাম বিকার থাকা পর্য্যন্ত,—হউন তিনি মাতৃতুল্যা প্রাচীনা, তদীয় পার্শ্বে উপবেশনে, তাঁহার অধিকার নাই

সে পর্য্যন্তই—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নবিবিক্তাসনো বসেৎ
বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি"*

শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপদেশ, যে পর্য্যন্ত না দেহের বিকার দূর হয় যাঁহার—

"কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্ত দ্বেষীজনে
লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ গুণ গানে
নিযুক্ত হইয়াছে যথা"

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা

তাঁহার কথা স্বতন্ত্র

---

* মা, ভগিনী বা কন্যারও একাসনে বসিবে না, বলবান ইন্দ্রিয়ের প্রতি বিশ্বাস নাই, বিদ্বান ব্যক্তিরাও ইন্দ্রিয়াকর্ষিত হইয়া থাকেন

শ্রীভগবৎ সেব মাত্রে যাঁহাব কাম পর্যবসিত, বহিবিন্দ্রিয়েব বিকাব যাঁহার নাই, সেই কামজয়ী ভাগ্যবান ব্যতীত পূর্বেবাক্ত শাস্ত্রাদেশ সকলেবই স্বীকার্য্য অন্যথায় পতন অনিবার্য্য কিন্তু এরূপভাবে কামজয় কি কবা সাধ্য ?

শ্রীচৈতন্যচবিতামৃতে আমবা দেখিতে পাই যে গৌর ভক্তগণ কামবিকার শূন্য ছিলেন শ্রীবামানন্দ বায়ের যুবতী স্পর্শেও, কাষ্ঠ স্পর্শের ন্যায় চিত্ত নির্ম্মল—বিকাব লেশ শূন্য থাকিত শ্রীলোচন দাস ঠাকুব গুরুব আদেশে স্ত্রীব সহিত থাকিতে বাধ্য হন, কিন্তু স্ত্রীব সহিত তাঁহার ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম কিছু ছিল না ; ইন্দ্রিয ইঁহাদেব কাছে "দন্তোৎপাটিত সর্পেব ন্যায খেলাব বস্তু" তবে কোন্ সাধনে এরূপ অসাধ্য সাধিত হইতে পাবে ? যাহাতে পারে, সাধকের সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বতোভাবে তাহাই অবলম্ব্য ।

সাধকের কিন্তু প্রথমে নামই সম্বল। আর সর্ব্বশক্তিসমন্বিত নাম ব্যতীত অন্য কি আছে যাহাতে এইরূপ সর্ব্বানর্থ বিনষ্ট কবিতে সমর্থ হইবে ?

দুর্গাপ্রাসাদ ঐ নামই দিবারাত্র অবিচ্ছেদে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কবিলেন।

নিদ্রা তাঁহাব প্রধান বাদী দাঁড়াইল। দিবসে কাজ করেন অনুসঙ্গে মনে মনে নামও জপেন ; কিন্তু রাত্রে কোথা হইতে নিদ্রা আসিয চক্ষু আবরিত কবে। অবিচ্ছেদে নাম আর হয না। কিন্তু নিতেই হইবে, নিদ্রা বর্জ্জন কবিতেই হইবে

এই জন্য ঐ কর্ম্মই এবারও তাঁহার সহায স্বরূপ হইল, তিনি সমস্ত রাত্র ভরিয়া কাজ করিতে লাগিলেন।

হাতুড়ী দ্বারা ধাতু পীড়ন করেন, কর্ম্মানুবোধে নিদ্রা আসে না, এদিকে নামরূপ হাতুড়ীতে সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় বিকারও পীড়িত

হইতে লাগিল   তিনি একা একদিকে আর অনুসঙ্গী ৩৪টি লোক পর্য্যায়ক্রমে অন্যদিকে   অনুসঙ্গিগণ একার সঙ্গে পরাস্ত

সারারাত্রি এরূপে কাজ করিবে, কাহারও সাধ্য ? একপ্রস্ত লোক কর্ম্মত্যাগ করিয়া পলাইল, নূতন প্রস্ত নিযুক্ত হইল, তাহারাও কার্য্যাতিশয়ে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল   লোক পরাস্ত হয়, কিন্তু কার্য্যে তাঁহার বিশ্রাম নাই ; প্রায় সমস্ত রাত্রি তিনি কাজ করিতে থাকেন কাজ উপলক্ষ, অবিশ্রান্ত নাম করাই উদ্দেশ্য

"আহার নিদ্রা মৈথুন ভয়,
যত কমাও ততই জয়।"— একথাটি দুর্গাপ্রসাদের উক্তি।

দুর্গাপ্রসাদ নিদ্রার প্রতি নহে, আহার ও মৈথুন এবং সাংসারিক ভয়োদ্বেগের প্রতিও সমভাবে বিতৃষ্ণ   কারণ ইহারাই সাধারণতঃ সাধনের কণ্টক   একবারে এই শত্রুর হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি এক উপায় অবলম্বন করিলেন

তখন হইতে তিনি স্বয়ং পাক করিয়া একবেলা আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। দেড় পোয়া তণ্ডুল ধরিতে পারে, নারিকেলের তদ্রূপ একখণ্ড মালায় ধৃত তণ্ডুল মাত্র প্রথম অবস্থায় গ্রহণ করিতেন   আর ক্রমশঃ আহার কমাইবার জন্য প্রত্যহ ঐ নারিকেল-মালা একবার করিয়া একটা প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয় ক্ষয় করিতেন   এইরূপে আহার কমাইতে আরম্ভ করিয়া পরে একমুষ্টি তণ্ডুলের অন্ন দৈনিক গ্রহণ করিতেন   এদিকে হাড়ভাঙ্গা কঠোর পরিশ্রম   সমস্ত রাত্র পরিশ্রম করিতেন, প্রভাতের পূর্ব্বক্ষণে একবার মাত্র অর্দ্ধঘণ্টা বা একঘণ্টার তরে উপবেশিত অবস্থায়ই হাঁটুতে মাথা রাখিতেন   নিদ্রার অল্প আবেশমাত্র হইত, আবার সূর্য্যোদয়েই গাত্রোত্থান করিতেন   এইরূপে দিবারাত্র অবিরত নাম চলিতে লাগিল   এইরূপভাবে প্রায় বৎসরেক গেল

কঠিন কাঁসা পিটিয়া তিনি পানের ডিবা প্রস্তুত করিতেন কয়েকটা প্রস্তুত হইলেই কোন মহাজনের কাছে উচিতমূল্যে পাইকারী হিসাবে বিক্রয় করিয় ফেলিতেন, কোনরূপ ঝঞ্ঝ টে যাইতেন না।

এইরূপে "অত্যধিক পরিশ্রমে কম লভ্য" জনক ব্যবসায় করিতে করিতে পারিবারিক ব্যয় বহন করিয়াও তাঁহার হাতে পাঁচ শত টাকা জমা হইল। এই পাঁচ শত টাকার মধ্যে ১০০৲ টাকা তিনি শিক্ষা গুরুকে দিলেন, এই সময় হইতেই সকলে তাঁহার গুরু পরিচয় প্রাপ্ত হইল মনোমোহিনীও জানিলেন যে দুর্গাপ্রসাদ তাঁহাকে গুরুর আসনে স্থাপিত করিয়াছেন অন্য ১০০৲ টাকা দীক্ষাগুরু ও পুরোহিত প্রভৃতিকে এবং বাকি ৩০০৲ টাকা ভ্রাতৃহস্তে অর্পণ করিলেন; বলি-লেন—"ভাই, আমার দ্বারা আর সংসারের কাজ হইবেন, যাহা সামান্য সম্পত্তি, তোমাদেরই থাকিল, আমাকে দিনান্তে একমুষ্টি তণ্ডুল মাত্র দিও, আর কিছু চাহিনা।"

তাঁহার মা ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই উন্মাদগ্রস্তা হইয়াছিলেন। বাড়ীতে পিসীমা থাকিতেন, দেবতার কাজ প্রধানতঃ এই পিসীমা কর্ত্তৃক হইত। দৈববশতঃ এই সময়ে তিনি অন্ধ হইয়া গেলেন ভ্রাতৃবধূদ্বারা দেবতার কাজ সুন্দররূপে না চলায় অসুবিধ ঘটিতে লাগিল দেবতার কার্য্য এক্ষণে কে করিবে? তাহারও বন্দোবস্ত করিলেন যে ব্রাহ্মণ দেবতার পূজায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাকে বড়ই কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন, তাহার কাকুতিতে ব্রাহ্মণ দেবতা নিতে সম্মত হইলে তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন দীর্ঘকাল যে ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীজনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিয়াছেন, তিনি কখনই সেবায় অবহেলা করিবেন না, এই ভাবিয়া তিনি পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি দেবতার সমস্ত তৈজসাদি উক্ত ব্রাহ্মণকে সমঝাইয়া, দেবতাকে তাঁহার করে অর্পণ করিলেন।

এক্ষণ হইতে দুর্গাপ্রসাদ অনেকটা মুক্ত হইলেন, আর সংসারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি রহিল না।

"যোগারূঢ়" না কি ?

উদ্যানের সুরভি কুসুম বৃক্ষ ;—কত সাবধানে রক্ষ করিতে হয়, বাঁচাইতে হয় বেড়া দিবা তৃণপত্রভক্ষক পশু হইতে দূরে রাখিতে হয় ঝড় বৃষ্টি রৌদ্রে যত্ন লইতে হয়, তবে বৃক্ষ বাঁচে ও কুসুম ফুটে। উদ্যান কুসুমের ন্যায় আমাদেরও বহু শত্রু আছে এবং নানা উপায়ে তাহাদের হাত হইতে মুক্ত থাকিতে হয়। কিন্তু কুসুমের আভ্যন্তরীন কীট নিবারণ বড় কঠিন কাজ আমাদেরও তাদৃশ আভ্যন্তরীন শত্রু-ষট্‌ প্রভৃতির হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কঠিন

দুর্গাপ্রসাদ এত যে কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন, কৈ, তবু তো তিনি নিজমনে সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছেন না ? নাম করেন,- নাম গ্রহণে বিরতি নাই। কিন্তু অবিশ্রান্ত নাম গ্রহণ তো এখনও হইতেছে হায়, তবে কি আশা পূরিবে না ? তবে কি শান্তি চিরতরে দূরে থাকিবে ?

যে যুবক শুধু খেয়াল বশে পুকুর সেচিয়াছিল সে শেষ পরীক্ষা না দেখিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইতে পারে না। নিদ্রা জয় ? নিদ্রা জয়ের সাধন কি ? দুর্গাপ্রসাদ জপবিঘ্নকর নিদ্রা জয় করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন।

> "আহার নিদ্রা মৈথুন ভয়,
> যত কমাও ততই জয়"

তিনি ভাবিলেন—সাধকের পক্ষে আহারই সকল অনর্থের মূল। আহার কমাইতে এবং অভ্যাস বশে ছাড়াইতে পারিলে অনেকটা কাজ হইবে, অপরের জন্য তত ভাবিতে হইবে না। আহারে দেহে রস সঞ্চার হয়, তাহাতেই বহিরিন্দ্রিয় সতেজ থাকে, তাহাতেই কামাদির উদ্বেগ হয়। আহার জনিত রস প্রভাবেই দেহ স্নিগ্ধ থাকে, তাহাতেই নিদ্রা উপস্থিত হয়। আহার আয়ত্তাধীন হইলেই ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রিত হইয়া যাইবে।

যত্ন বিনা রত্ন মিলে না, সাধন বিনা সিদ্ধি ঘটে না। সাধন চাই। শ্রীদাস গোস্বামী দৈনিক ২।৩ পল মাঠা মাত্র খাইতেন। শেষকালে তাহাও ছিল না, ২।৩ দিন অনাহারে পড়িয়া থাকিতেন।* শ্রীরূপ সনাতনেরও শেষাবস্থায় আহার ছিল না বলাই সঙ্গত। হরি-নাম-রস মদিরা পানে তাঁহারা বিভোর হইয়া পড়িয়া রহিতেন। কৃষ্ণ প্রেমধন সহজে মিলে না।

দুর্গাপ্রসাদ একমুষ্টি অন্নাহার করিতেন। তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না। চতুর্ব্বিংশোর্দ্ধ বয়স্ক যুবক; যে সময়ে চিত্তে নানা বিলাস লালসার লীলা লহরী খেলিতে থাকে, তখন আহারাদি বিষয়ে এরূপ কঠোরতা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, শুনিলে চমকিত হইতে হয়। তখন আর তাঁহার দৈনিক মুষ্ট্যন্ন গ্রহণের প্রতিও দৃষ্টি রহিল না। কোন দিন দুগ্ধ পান করিতেন, কোন দিন ফল মূল খাইতেন, কোন-দিন বা মুষ্টিমেয় অন্ন গ্রহণ করিতেন। এইরূপে কিছুদিন গেল।

কিন্তু নিদ্রা তো তবুও পাছু ছাড়ে না, নিদ্রার জ্বালায় অবিশ্রান্ত নাম গ্রহণে বাধা উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে কর্ম্মানুরোধে সারারাত্রি কাটাইয়া দিতেন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হাঁটুতে একটু কাল মাথা রাখিতেন, পূর্ব্বে ইহাতেই সামান্য একটু নিদ্রাবেশ হইত।

* মৎকৃত শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত গ্রন্থে ইহা বর্ণিত আছে।

এক্ষণে কার্য্যত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু প্রবীণ ব্যক্তির মধ্যে নিদ্রার সহিত তাঁহাকে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইত। যখন নিদ্রা আসিত, দৌড়িয়া গিয়া জলে নামিতেন, নিদ্রা দূরে পলাইত। কোন দিন দারুণ শীতের মধ্যে গায়ের কাপড় খান সরাইয়া দিতেন, শীতের তাড়নে নিদ্রা দূর হইত। গ্রীষ্মের দিনে খালি গায়ে অনেকরাত্র বসিয়া রহিতেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে সহস্র মশক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া যেন সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিত। তাহাতেই নিদ্রাদেবী ভয়ে পলাইতেন।

এই সময় তিনি নিরুদ্বেগে নাম গ্রহণের জন্য আর এক উপায় অবলম্বন করিলেন।

বাড়ীতে চারিখানা গৃহ ছিল, তন্মধ্যে উত্তরের গৃহেই তিনি থাকিতেন, সেই গৃহে বসিবার জন্য একখান কুশাসন ছিল, শয্যাপত্র কিছু ছিল না। শুইবার চেষ্টা মাত্র করিতেন না, শয্যা রাখার আবশ্যকও ছিল না। এই গৃহের উচ্চদেশে একগাছি বড় শিকা খাটাইলেন, রাত্রে এই শিকায় উঠিয়া বসিতেন ও শূন্যে ঝুলিয়া ঝুলিয়া নাম জপ করিতেন। সহজে নিদ্রাবেগ হইত না, হইলে দোলন বেগে অথবা পড়িয়া যাইবার ভয়ে নিদ্রা দূর হইত। এইরূপ সাধনে একবর্ষ অতীত হইল।

তার পর ইহাও ত্যাগ করিলেন। আহার নিদ্রা তখন অনেকটা আয়ত্তাধীন হইয়াছে। মনে অনেকটা সাহস ও উৎসাহ জন্মিয়াছে। তখন দুর্গাপ্রসাদ তিন দিন অন্তর একবার করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

দুর্গাপ্রসাদ কোনরূপ যোগাঙ্গ সাধন করেন নাই, তাঁহার সাধন শুধু নাম গ্রহণ। কিন্তু তিনি যোগী পুরুষের ন্যায় অন্ন ও নিদ্রা ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী প্রভৃতি কোন কোন শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের চরিত্রের বাহ্যকঠোরতা আমরা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি, তাহাতে

জানিযাছি যে, ভক্ত যখন ভক্তিধন আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন, তখন যোগের ক্ষমতা তাঁহাদের আপনা আপনি করায়ত্ত হয়, ভক্তিযোগে বিভূতির জন্য চেষ্টা করিতে হয় না, ইহা ভক্তের চরণে আপনি অযাচিতভাবে লুটাইয়া থাকে নাম সাধক শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের যে সমাধি দশা * দর্শনে প্রহারকারী যবন পাইকগণ তাঁহার মৃত্যু অনুমান করিয়াছিল তজ্জন্য তাঁহাকে কোনরূপ কঠোরতা করিতে হয় নাই, নামের কৃপায় এ সব বিভূতি আপনি আসিয়া উপস্থিত হয় দুর্গাপ্রসাদ হইতে লোকে দেখিল যে, সেই সব ঘটনা মিথ্যা বর্ণনা নহে, এসব এখনও হইতে পারে

আমরা গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, শ্রীদাস গোস্বামী প্রভৃতির দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইযাছিল, সে দেহ যষ্টি "বাতাসে হালিত" তিন দিন অন্তর অন্ন গ্রহণ করিযা থাকিতে দুর্গাপ্রসাদ সমর্থ হইলেন তাঁহার ন্যায সাধকের কাছে প্রকৃতি দাসীবৎ, শিলা তাঁহাদের কাছে জলে ভাসে, অগ্নি জল হইযা যায, তাঁহাদের অসাধ্য কি থাকিতে পারে ? কিন্তু তাঁহার দেহযষ্টি শুষ্ক হইয়া গেল,—পঞ্জরের এক একটি অস্থি গণনা করা যায, দেহ "বাতাসে হালয"

আত্মীয কুটুম্ব নিতান্ত দুঃখিত হইল, পাড়াপ্রতিবেশী ভীত হইল ; সকলেই তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিল কিন্তু তিনি অচল— অটল, তিনি দিবারাত্র নামরসে নিমগ্ন এইরূপে আর একবৎসর কাটিয়া গেল

তিন দিনান্তর আহারে মাসে আটদিন মাত্র অন্নগ্রহণ, ইহাতে দেহ শুষ্ক না হইবে কেন ? তাঁহার মাসী তাঁহার গৃহে থাকিতেন সেই বিধবা মাসী একাহারী ও নিরামিষ্য ভোজী ছিলেন ; এই একবৎসরান্তে তিনি তাঁহাকে অনেক বলিয়া কহিয়া স্বীকৃত করাইলেন যে, অতঃপর

* মৎকৃত শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবনচরিত গ্রন্থে ইহা বর্ণিত আছে

তিনি তাঁহারও অন্ন পাক করিয়া দিবেন মাসার একান্ত উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি পাক ও পরিবেশন করিলে সাধকের ত হবের পরিচ্ছা ও নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারিবেন

এই সময় হইতে লোকের সহিত বড় একটা আলাপ করিতেন না নিতান্ত প্রয়োজনে দুই একটী কথা কহিতেন সংসারের সহিত তখন কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না, তখন কর্ম্মযোগ কিম্বা বিষয়ে তো নাই-ই, পরন্তু স্বভাবজ ইন্দ্রিয় ব্যাপারেও আসক্তিহীন হইয়াছেন এবং তাহাও আয়ত্তাধীন হইয়াছে, সুতরাং সাধক অনেকটা সিদ্ধির দিকে চলিবার পথে শাস্ত্র যে অবস্থাকে যোগারূঢ় বলিয়াছেন, আমাদের সাধকও এক্ষণে কতকটা যেন সেই অবস্থায় উপনীত *

সিদ্ধির পথে।

এক্ষণে সাধকের ভাব আরও গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে নিরন্তর একান্তে থাকেন, দেহ মন সংযত আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্গশূন্য, কিছুরই প্রতি পরিগ্রহ বুদ্ধি নাই শাস্ত্রে যোগারূঢ় সাধুর যে লক্ষণ দেখা যায়, তাহার কতকটা প্রমাণ তদীয় চরিত্রে পরিলক্ষিত হইতেছে

---

* যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে
সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে।
গীতা—৬ষ্ঠ অঃ

† "যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসিস্থিতঃ
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ"
গীতা ৬ষ্ঠ অঃ

এতৎপূর্ব্বে বৈষ্ণব-শাস্ত্র সম্মত বৈধাচার প্রতিপালনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল কিন্তু এই অবস্থায় যেন অনেকটা ভাব চালিত হইতে লাগিলেন নিজের শক্তি যেন দেহের উপর কার্য্য করিতে সময় সময় অক্ষম হয়, সময় সময় যেন ভাবের বন্যাই তাহাকে স্বেচ্ছাস্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায় মালা তিলকাদি কখন করেন, কখন না, একাদশ্যাদি সম্বন্ধেও তাহাই গায়ে সেই জীর্ণ কন্থা, এবং পরিধানে একখানা বস্ত্র, তাহারও "লেঙ্গটের" মত পাছের দিকে গুঁজিয়া রাখিতেন

শ্রীমদ্রূপসনাতন চরিতে * লিখিয়াছি যে, বাহ্যবেশ বৈরাগ্যের উপযোগী হওয়া কর্ত্তব্য যদিও ধর্ম্মের সহিত বাহ্য বেশের সম্বন্ধ অল্প, তথাপি সাধকাবস্থায় ইহার প্রয়োজন সাধকাবস্থায় মালাতিলকাদি অবশ্য গ্রহীতব্য। সিদ্ধাবস্থায় কেহ ইহার বড় গরব করে না এবং তাহাতে কোন প্রত্যবায়ও হয় না

কিন্তু কোন অবস্থাতেই কৃত্রিমতা ভাল নহে ধর্ম্ম জগতে কৃত্রিমতার তুল্য দ্বিতীয় শত্রু আর নাই লোক দেখাইয়া বড় বড় তিলক কাটা বা বেশ ধারণ একটা অপরাধ মধ্যেই গণ্য শ্রীসনাতন গোস্বামী কাহাকেও ভেখের গুরু স্বীকার করেন নাই, কঠোর বৈরাগ্য উপজাত হইলে লজ্জাবারণ জন্য যেটুক আবশ্যক, ততটুক বস্ত্রই মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ অনুরাগ ও প্রকৃত বৈরাগ্য ব্যতিরিক্ত লোক দেখান ভেখ আর যাত্রা গানের নারদের ভেখ একই কথা।

আমাদের সাধকও এইরূপ কৃত্রিমতা ভালবাসিতেন না, ভেখ গ্রহণের আবশ্যকতাও তিনি অনুভব করিতেন না। গৃহে থাকিয়াই ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পারে,—গৃহে থাকিয়াই কঠোর বৈরাগ্য এবং ভক্তি যোগে যে সিদ্ধ হওয়া যায়, তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন কাজেই

* শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল

তিনি শ্রীসনাতনের ন্যায় যথাপ্রয়োজন বস্ত্রটুক মাত্র দেহপটের মত ব্যবহার করিতেন, কোনরূপ ভেখ লইয়া "বৈরাগী" সাজেন নাই

এইরূপে নাম করিতে করিতে নামের সঙ্গেই যেন তাঁহার চিত্ত একীভূত হইয়া গেল, কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ নাই কেবল নাম জপ

"হরিবোল হরিবোল কেবল মাত্র হরিবোল "

"তন্ত্র নাই মন্ত্র নাই কেবল মাত্র হরিবোল "

তাঁহার মনেও আর কিছু নাই "কেবল মাত্র হরিবোল "

অবিশ্রান্ত হরিনামের গতিকে এবং অন্যালাপ ত্যাগে আর কথা কহিতে ইচ্ছাই হইত না, অবশেষে তাঁহার বাক্য বন্ধ হইয়া গেল বাকবন্ধ কি, জানিনা কিন্তু এই সাধুতে দেখা গেল প্রথমে কথা কহিতে ইচ্ছা হইত না, কিন্তু শেষটা ইচ্ছা করিয়াও কথা কহিতে পারিতেন না

কোন সাধকের আর এরূপ ঘটিয়াছে কি না জানি না, এবং ঘটে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু এই সাধুতে এমন ঘটিয়াছিল,—জানি আলাপ বর্জ্জন পূর্ব্বক অবিরত নাম করিতে করিতে বাক্যবন্ধ হইয়াছিল তখনকার অবস্থা ইচ্ছা অনিচ্ছার আয়ত্তাধীন নহে, কথা কহিবার ইচ্ছা করিলে তখন সে প্রয়াস নিষ্ফল হইত

এই বাক্যবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্নানাহারের ইচ্ছা, কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য জ্ঞান, এসবও যেন লোপ পাইল, কতকটা যেন উন্মত্তের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন তখন তাঁহার প্রতি নামের পূর্ণ কৃপা হইয়াছে, অবিরত নাম হয়, ইচ্ছা অনিচ্ছার আর অপেক্ষা নাই তনু মন তখন নামানুভাবিত, তাই উপবেশনে, গমনে, গৃহে, বাহিরে, যেখানেই থাকুন না, তালুমূলে টক্ টক্ শব্দ শুনা যাইত, যেন ঘড়ির কাঁটা চলিতেছে বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অবিরত চলিতেছে—টক্ টক্ টক্

এ অবিরত টক্ টক্ ধ্বনি কি ? এ ধ্বনি নিরন্তর নামাভ্যাস জাত, এ ধ্বনি স্বয়ং উদ্গত নামের প্রতিক্রিয়া জাত প্রতিধ্বনি প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাস সহ তখন নাম স্বয়ং উচ্চারিত হইতেছে,—নাম তখন "অজপার" সহযোগে স্বয়ং অজপা রূপে নিরন্তর জপিত হইতেছে

স্নানাহারের স্মৃতি যেন নাই, যেন কতকট উন্মত্ত লোকে উন্মত্ত বলিয়াই মনে করিতে লাগিল তাহারা বুঝিল না—জানিল না যে এ উন্মত্ততা দেববাঞ্ছিত, এ উন্মত্ত প্রাপ্ত হইলে আর কিছুরই অভাব থাকে না

তখন ক্ষণে ক্ষণে হুঙ্কার করেন, ক্ষণে ক্রন্দন করেন, কখন বা পাগলের প্রায় দ্রুত ধাবিত হন, কখন বা নৃত্য করেন আমরা শাস্ত্র দৃষ্টে জানিতে পারি যে, এ অবস্থা নিতান্ত সৌভাগ্য নহিলে লাভ করা যায় না, এ অবস্থা নামের কৃপা হইলেই হইয়া থাকে, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,

"এবং ব্রত স্বপ্রিয় নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগ দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ"

এই অবস্থায় তিনি নির্জ্জনবাস ত্যাগ করিয়াছেন—অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য নাই যে কেহ ডাকে, তাহার সঙ্গেই যান যে যথায় থাকিতে আদেশ করে,—অবস্থিতি করেন স্বেচ্ছাতঃ যে কেহ খাইতে দেয়,—খান তখন আর দাসী-প্রস্তুত অন্ন গ্রহণের নিয়ম নাই

অজপা কি ? নারদ পঞ্চরাত্রে অজপার কথা আছে মোটমোটি নাম যখন সাধকের ইচ্ছা সাপেক্ষতা রহিত রূপে উচ্চারিত হয় সে অবস্থা বলা যাইতে পারে না কি ?

কোথাও সংকীর্ত্তন হইলে, যে কেহ নিয়া যায়—যখন মুখে বাক্যোচ্চারণ নাই কিন্তু কীর্ত্তনে যে অবাক্ পুরুষ যোগ দিতেন, তখন সংকীর্ত্তনোত্থিত নাম তরঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার দেহে ভাব তরঙ্গ তুলিয়া দিত তখনকার ভাবের বিকার—নৃত্যের আতিশয্য বর্ণনাতীত। আর এক অদ্ভুত যে, এই অবাক্ পুরুষকে সংকীর্ত্তনে লইয়া গেলেই কীর্ত্তন জমিয়া যাইত, কীর্ত্তনীয়াগণ ভাবরসে নিমজ্জিত হইত, এই জন্য অনেকেই তাঁহাকে কীর্ত্তনে আগ্রহ করিয়া নেওয়াইতেন। এই সময়েও শিক্ষাগুরু দর্শনে তাঁহার বিরতি হয় নাই, এই সময়েও তাঁহার কাছে যাইতেন, কিন্তু বোধ হইত, যেন তাহা পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ, যেন বাহ্যজ্ঞান নহে

"নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় "

ইহা মহাপ্রভুর উক্তি।

অপরাধ বর্জ্জন পূর্ব্বক নাম কীর্ত্তনে নামের দয়া হয়, কিন্তু নামের পূর্ণ ফল পাইতে হইলে তখনও নাম সাধককে সতর্ক থাকিতে হয়, দম্ভাভিমান হইতে দূরে থাকিতে হয়, তখন শ্রীমহাপ্রভু কথিত "তৃণাদপি" ভাবে চলিতে হয় শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি, যথাঃ

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানীনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ

অর্থঃ "উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জানি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আমাদের সাধকবরের এক্ষণে যথার্থই তৃণাদপি নীচ। তৃণ পদদলিত হইলে নত থাকে, কিন্তু পদ উত্তোলনে তাহার সমাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এ সাধকের এক্ষণে সততই অবনতাবস্থা, সততই তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা। এক্ষণে মান্যামান্য-জ্ঞান নাই নিতান্ত তুচ্ছ ব্যক্তিরও আদেশ পালনে সদা ব্যস্ত। আর হরিনাম কীর্ত্তন, সে তো অবিরত আছেই,—সেই টক্ টক্ টক্, তালুমূলের সেই অবিরত অশান্ত ধ্বনি, তাহার বিরাম নাই।

পরীক্ষা।

যখন সাধকবর এইরূপ অবধূত ভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন, তখন একজন ভদ্রব্যক্তি একদা তাঁহাকে পথে পাইলেন, এই ব্যক্তির নাম কালীচরণ তরফদার। তরফদার বলিলেন—"চল সাধু, আমার গৃহে চল।" আদেশবর্ত্তী সাধু তখন যেন তাঁহার ভৃত্যের ন্যায় তদীয় আদেশ পালনার্থ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়, তরফদার সাধুসহ নিজগৃহে উপনীত হইলেন; তরফদারের বাড়ীতে এক মহিষশালা আছে, সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া বাড়ী প্রবেশ করিতে হয়। উভয়ে সে গৃহ পার্শ্বে উপনীত হইলে তরফদার বলিলেন, "সাধু, আজ এই স্থানেই দাঁড়াইয়া রাত্রিটা কাটাইয়া দাও।"

অবাক পুরুষ আদেশ শুনিলেন ও তথায় দাঁড় হয় রহিলেন। তরফদার বাড়ী গেলেন, আহার করিলেন, সাধুর কথা মনেও জাগিল না, আহারান্তে ঘুমাইয়া পড়িলেন

গো-গৃহ ও মহিষশালা মশকের তৃপ্তিকর বিশ্রামাগার, ইহা সকলেই জানেন মুহূর্ত্তমধ্যে সহস্র সহস্র মশক তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইল, সে রাত্র সাধুদেহে হুল বিদ্ধ করিয়া সে অযুত মশক সাধুস্পর্শ অনুভব করিল। এইরূপ সাধুস্পর্শ তাহাদের পক্ষে পুণ্যজনক হইয়াছিল কি না তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ সাধুর মনের অবস্থা আমরা কি জানি? সাধুদের সুখ দুঃখের অনুভূতি ঠিক আমাদের মত নহে।

মশকের বীণাধ্বনি তো আছেই, সময় বুঝিয়া ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, মশকধ্বনির সহিত মেঘগর্জ্জন ও বায়ুর সোঁ সোঁ শব্দ এবং বৃষ্টির ঝম ঝমানি মিলিত হইয়া এক রুদ্র তানের সৃষ্টি করিল। বাহিরে বাহির হয়, কাহার সাধ্য? কিন্তু আদেশবাহী সাধুর তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি স্থাণুর ন্যায় একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন

এ দারুণ দুর্য্যোগে কে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে পারে? মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎস্ফুরণ ও সঙ্গে সঙ্গে বিকট গর্জ্জন তরফদারও জাগিলেন; সাধুকে পরীক্ষা করার ভাব তখন মনে স্থানও পাইতেছে না, প্রকৃতির এ রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ভীতচিত্তে বাহিরে আসিলেন আসিয়া দেখেন যে সেই নির্ব্বিকার পুরুষ প্রশান্তমনে তদবস্থায়ই এক স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন বায়ুবেগে মশককুল দূরে গেলেও তখনও তাঁহার নিকটে মশকের ধ্বনির সম্যক্ বিরতি হয় নাই।

তরফদার এমন সহিষ্ণুতার কথা শুনেন নাই, এমন প্রশান্ততা কখনও দেখেন নাই সাধুকে যথার্থই তাঁহার সাধু বলিয়া বোধ হইল, তিনি নিজ দুর্ব্যবহারের জন্য বিচলিতচিত্তে যোড়হাতে তাঁহার

কাছে অনেক মিনতি করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। তৎপর যখন যথা ইচ্ছা যাইতে বলিলেন তখন সাধুবর তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

পরদিন গ্রামে এ কথা প্রকাশিত হইল, তরফদার স্বয়ং সকলের কাছে ইহা প্রচারিত করিলেন। তদবধিই তিনি "সাধু" নামে সাধারণে পরিচিত।

* * * *

বর্ণাশ্রমাদি যে কোন ধর্ম্মেও আস্থাবান থাকিলে ধর্ম্মসঙ্কটে ধর্ম্মই তাঁহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করেন। সাধুর যখন খাদ্যাখাদ্য, জাতি বিজাতিতে ভেদ বুদ্ধি নাই, যখন যে কেহ ডাকিলেই যান, অযাচিত ভাবে যাহা কিছু দিলে খান, তখন ধর্ম্মই সেই ধার্ম্মিক সাধুকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

একদা একজন মুসলমান নিজ বাড়ী যাওয়া কালীন সাধুকে পথে পাইয়া বলিল, "চল সাধু, আমার গৃহে চল।" নির্বাভিমানী সাধু আদেশবাহী ভৃত্যবৎ তৎসঙ্গ চলিলেন। যবনের উদ্দেশ্য—সাধুকে আহার দিবে। অর্দ্ধপথ গিয়াই কিন্তু তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল; সে তথা হইতে সাধুকে ফিরাইয়া দিল। ধর্ম্মই যেন স্বয়ং সাধুর জাতি রক্ষা করিলেন। এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, অন্যজাতীয় লোক কখনই সাধুকে খাইতে দিত না।

দুষ্ট লোক পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতি নিদারুণ নির্য্যাতনও করিতে ছাড়িত না, কেহ বা প্রহার করিত, কেহ বা অন্যবিধ যন্ত্রণা দিত। আহার কোন দিন এক বেলা, কখন বা দুই তিন দিনে কেহ দিলে খাওয়া হইত।

ভ্রাতৃদ্বয় এবং আত্মীয় স্বজন মায়াবশে এই সময় তাঁহাকে ভিন্নস্থান হইতে প্রায়ই খুঁজিয়া গৃহে আনিতেন ও মাসীপ্রস্তুত অন্ন খাইতে দিতেন। তাঁহারা দেখিতেন, সাধুর বাহ্যজ্ঞান একরূপ নাই কিন্তু আদেশ পালনে সদা উন্মুখ। খাওয়ার কথা বলিয়া অন্ন দিলে খাইতে

বসেন, কিন্তু দুই এক গ্রাস খাইতে না খাইতেই আবার অনিচ্ছা উদয় হয়, অমনি অন্ন ত্যাগ করিয়া উঠেন আর সেই নামের টক্ টক্ ধ্বনি, তাহা আছেই উপবেশনে, গমনে ব দৈবৎ শয়নে, ধ্বনির আর বিরাম নাই এইরূপে আরও এক বৎসর অতীত হইল

অতঃপর সাধুর বাহ্যোন্মত্ত কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল পরে ক্রমশঃ সাধু অনেকট স্থির হইলেন সাধুকে কিঞ্চিৎ স্থির হইতে দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়বর্গ বড়ই আনন্দিত হইলেন তখন হইতে মাসী প্রত্যহ একবেলা করিয়া অন্ন দিতে থাকিলে অস্বীকৃত হইলেন না।

মাসী থালাতে অন্ন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার কাছে থাল রাখিয়া আসিতেন; সাধু তদনন্তর আহার করিতেন; এইরূপে কয়েক দিন গেল

আর একদিন মাসী যথারীতি অন্ন লইয়া আসিয়াছেন; মাসী অন্ন রাখিলেন কিন্তু সেদিন এ অন্ন গুরুগৃহে লইয়া যাইতে সাধু ইঙ্গিত করিলেন মাসী বুঝিলেন যে, সাধু এখন গুরুর প্রসাদ গ্রহণ করিবেন ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি সেই অন্ন থালা লইয়া মনো-মোহিনী গৃহে গেলেন, মনোমোহিনীকে সাধুর অভিপ্রায় বলিলেন ও খাইতে অনুরোধ করিয়া খাওয়াইলেন

মাসীদ্বারা এইরূপ সাধু প্রত্যহ গুরু-প্রসাদ পাইতে লাগিলেন কয়েকদিন এইরূপ চলিল কিন্তু গৃহস্থ পরিবারে সামান্য পাড়া গ্রামে এরূপ ব্যবহার লোকের ভাল লাগিবে কেন? মনোমোহিনীর পরিবারের অনেকেই ইহাতে বিরোধী হইল, কাজেই মাসীকে কয়েকদিন গোপনে অন্ন লইয়া যাইতে হইয়াছিল মনোমোহিনীও মাসীকে নিষেধ করিতেন, মাসীরও তত বড় ভাল লাগিত না, তবে প্রসাদ ব্যতীত সাধু খাইবেন না বলিয়া বাধ্য হইয়াই যাইতেন সম্ভবতঃ

একদা মাসী এই বিষয়ে কৃত্রিমতা করিয়া থাকিবেন, তাই সাধুর মনে সন্দেহ উপজাত হয়

সাধু বাক্যোচ্চারণে অসমর্থ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আচরণে বোধ হয় যে তাঁহার মনে মাসী বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল

ঠিক এই দিনই একটা দৈব ঘটনা ঘটে সেদিন বড়ই ঝড় বৃষ্টি হইল, ঝড়ের বেগে সাধুর বাস গৃহের চাল উড়াইয়া লইল, মুষল-ধারে বৃষ্টিতে সাধু পরিস্নাত হইলেন

তুফান কিঞ্চিৎ কমিয়াছে, কিন্তু তখনও বৃষ্টির বেগ থামে নাই, শীতল বাতাস বহিতেছে, তাঁহার ভ্রাতা তখন সাধুর কাছে গিয়া অন্য ঘরে যাইতে অনুরোধ করিলেন সাধু কিন্তু অবিচলিত ভাবে সেই চালরহিত ভগ্ন গৃহে নামরসে বসিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিলেন

রাত্রি প্রভাত হইল, গ্রাম্যলোক দেখিতে আসিল, দেখিল যে সাধু চালশূন্য গৃহে জলস্নাত হইয়া আর্দ্রবস্ত্রে নামরসে বসিয়া রহিয়াছেন সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল তাঁহাকে গৃহান্তরে যাইতে অনুরোধ করা হইল, কিন্তু নির্ব্বাক সাধু অবিচলিত তখন গ্রামবাসিগণ পরামর্শ করিয়া সেই ঘরই মেরামত করিয়া দিতে লাগিল, সাধু সেই একস্থানেই বসিয়া রহিলেন

এইবার সাধুর নিয়মিত সেবা আরম্ভ হইল।

— ০ —

সাধন বিনা সিদ্ধি ঘটে না।

ভগা গৃহের চালাদি সেই দিনই প্রস্তুত হইল, সেই দিন হইতে স ধু সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন

এক্ষণে তাঁহার মনে কোন উদ্বেগ নাই, এক্ষণে নামের গুণে দেহেন্দ্রিয় সংযত,—এক্ষণে

"আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি" এই যে শাসননীতি, তাহার অতীত অবস্থায় তিনি উপনীত, এক্ষণে ইহা হইতে আর ভয় নাই এক্ষণে তিনি

* "সেব্য বুদ্ধি আরোপিয়া সেবন" " করিতে সমর্থ হইলেন

ফল কথা যখন সাধক সিদ্ধি লাভে তৃপ্তি অনুভব করিতে সমর্থ হন, স্ত্রী বা পুরুষ হইতে, কামাদি রিপু হইতে তাঁহার ভয় অনেকটা থাকে না, তখন এ বিচারে তিনি অনেকটা নির্ভীক হইতে পারেন নতুবা রমণীবিষয়ে পুংদেহধারী সাধকের এবং পুরুষ বিষয়ে স ধন মার্গানুসারিণী নারীর সদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

এই জন্যই এতদিন পরে এতদূর কঠোর নিয়ম নিষ্ঠার পরে আমাদের সাধু স্বয়ং গুরু সেবায় নিযুক্ত হইলেন

গুরু পাদপদ্ম সেবা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, এইবার আমাদের সাধুর দৃষ্টান্তে লোকে দেখিতে পাইল যে, সেবায় কিরূপ দার্ঢ্য থাকা কর্ত্তব্য

---

* উপাস্য বুদ্ধি আরোপ করিতে সমর্থ হইলে অর্থাৎ "আলম্বনে" উপাস্য বুদ্ধির "উদ্দীপন" স্থায়িত্ব লাভ করিলে আর মনে জড়াভিমানাদি থাকিতে পারে না, ইহাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অভিপ্রা য়

এই দিন সকালেই সাধু গুরুগৃহে গিয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া আসিলেন। এই দিনই তাঁহার আকার ইঙ্গিতে মাসী বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি স্বয়ং পাক করিবেন। মাসী কথাটি মাত্র বলিলেন না। পাকের যোগাড় করিয়া দিলেন। সাধু স্বয়ং পাক করিলেন, করিয়া থালায় সাজাইলেন, তারপর সে থাল স্বয়ং লইয়া গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। থালা যথাস্থানে রাখিলেন, রাখিয়া নির্ব্বাক সাধু বসিয়া রহিলেন। পরে গুরুর ভোজন হইল, তিনি সে স্থানে বসিয়াই প্রসাদ পাইলেন ও পরে স্বয়ং উচ্ছিষ্ট পরিমার্জ্জন করিলেন; তাহার পর চলিয়া আসিলেন। সন্ধ্যা হইলে সাধু পুনঃ গুরুগৃহে গমন করিলেন ও গুরুকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলেন। সেবা এইবার এই রীতিতে চলিতে লাগিল।

মনোমোহিনীর চারি পুত্র ও এক কন্যা, ইহাদের মধ্যে দুইজনই সাধু হইতে বয়োধিক ছিল। সাধুর এইরূপ ব্যবহার প্রথমতঃ তাহাদের কাছে কেমন তর লাগিল, পাড়া প্রতিবেশীরাও ইহা লইয়া বিদ্রূপ আরম্ভ করিল। হাস্য বিদ্রূপে সাধুর কিছু আসে যাইবে না ইহা সকলেই জানিত, কাজেই এ বিদ্রূপের আঘাত মনোমোহিনীর অঙ্গেই বাজিতে লাগিল। তাই মনোমোহিনী সাধুকে নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সাধুর কিছুতেই বিরতি নাই, কিছুতেই তাঁহার উদ্যমের ভঙ্গ নাই। যে ব্যক্তি বাল্যাবস্থায় প্রতিজ্ঞা বশে একা পুকুর সেচন করিয়াছিল যে যুবাবস্থায় ইচ্ছার বশে একা কঠিন কাঁসা পিটিয়া দিবা রাত্র কাটাইয়া দিত, লোকের বিদ্রূপ তো তুচ্ছ, গুরু মনোমোহিনীর নিষেধও তাঁহাকে ভগ্নোদ্যম করিতে পারিল না।

গোবিন্দ নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গ সেবা করেন। একদা কীর্ত্তনে উদ্দণ্ড নৃত্য পরিশ্রমের পর শ্রীমহাপ্রভু দ্বারদেশে পড়িয়া রহিয়াছেন। গোবিন্দ ভিতরে যাইবেন, গিয়া অঙ্গ টিপিবেন, ইহাই

তাঁহার সেবা গোবিন্দ বলিতেছেন—"গোসাঁঞি উঠ, ভিতরে যাইব" প্রভু উঠেন না গোবিন্দ বলিতেছেন "প্রভু, আমি অঙ্গ সেবা করিব, উঠ একপাশ হও" প্রভু যেন আলস্য বশতঃ বলিতেছেন "সেবার প্রয়োজন নাই আমি উঠিব না গোবিন্দ তখন একখানা বস্ত্র প্রভুর উপরে দিলেন দিয়া গৃহে গিয়া অঙ্গ সেবা করিলেন

"গোবিন্দ বলয়ে আমার সেবা সে নিয়ম
অপরাধ হউ, কিম্বা নরকে গমন" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আমাদের সাধু মনোমোহিনীর নিষেধ সত্ত্বেও অন্ন থালি লইয়া নিয়মিত উপস্থিত হন, তিনি নিয়ম ভঙ্গ করেন না সেই প্রভাতে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ ভক্ষণ, ইহাই নিয়মিত সেবা রূপে চালাইতে লাগিলেন এই সময় সাধুর উন্মত্ত মাতৃদেবী লোকান্তরে গমন করেন

অতঃপর একদিন সাধু অন্নথালা লইয়া গুরুগৃহে গেলেন দেখিয়াই মনোমোহিনী তাঁহাকে নানাবিধ গালি দিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন, এবং সেই অন্ন গ্রহণ না করিয়া থালা সমেত অন্ন ফেলিয়া দিলেন

সাধুর প্রতি যদিও মনোমোহিনীর বিরাগের কোন কারণ ছিল না, তথাপি সে পুত্রবতী বর্ষীয়সী রমণী লোক গঞ্জনায় পীড়িত হইয়া মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, সেদিন হইতে কদাপি সাধুকে এরূপ প্রশ্রয় দিবেন না; তাই তিনি সেদিন এইরূপ কঠোর ব্যবহার করিলেন

নির্ব্বাক সাধু কি করিবেন? চলিয়া আসিলেন ও যথাস্থানে বসিয়া রহিলেন

সেবা হইল না বদন বিরস, বিরস বদনে নিজ ঘরে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ভ্রাতা তদীয় শুষ্ক বদন দেখিয়া, এবং অনুসন্ধানে বুঝিলেন যে খাওয়া হয় নাই তিনি তখন ঘর হইতে কলা ও দুধ আনিয়া দিলেন সাধু তাহা স্পর্শ করিলেন না।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন গেল খাওয়া হইল না পরিজনবর্গ ভীত হইয়া মনোমোহিনীকে, আনিতে যত্ন করিল, তিনি আসিলেন না, বলিলেন—"আমার তাতে কি ? কেহ খাইতেছে কি না খাইতেছে, আমি তার কি জানি ?" আত্মীয়গণ নিরুপায় হইয়া চলিয়া আসিল আরও দুইদিন গেল, সাধু জলবিন্দুও গ্রহণ করিলেন না

এ সময় সাধু নিজ বাড়ী গিয়াছিলেন ভ্রাতৃদ্বয় ভাবিলেন, হয়ত মাসী খাওয়াইতে পারিবেন, তাঁহারা বিবিধ চেষ্টা করিয়া নিরুপায় হইয়াছিলেন এবং ভ্রাতৃস্নেহে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন

তাঁহারা এইরূপ মনে করিয়া সাধুসহ বাণিয়াচঙ্গে, —প্রায় দুই দিনের পথ মাসীগৃহে নৌকাযোগে চলিলেন পথেও সাধুর খাওয়া হইল না

সাত দিনের উপবাসী ; স্নেহতৎপর ভ্রাতা সাধুকে ধরিয়া ধরিয়া মাসীর বাড়ী উঠাইলেন অবস্থা দেখিয়া ও বিবরণ শুনিয়া মাসী বিলাপ করিতে লাগিলেন কান্না কাটা করিয়া খাওয়াইতে যত্ন করিলেন

শ্রীচরিতামৃত দাস গোস্বামী সম্বন্ধে লিখা আছে—

"রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরে লেখা" দুর্গা সাধুর এ নিয়মও যেন পাথরের রেখা, মাসীর নয়ন জলে তাহা মুছিল না তথাকার গণ্য মান্য ব্যক্তিগণও যত্ন করিয়া নিরস্ত হইল মাসী গৃহে তিন দিন থাকা হয়, তিন দিনই অনাহারে রহিলেন, দশ দিন গেল দশদিনের পর দেশে ফিরিয়া আসা হইল, পথের দুই দিন সহ এইরূপ অনাহারে বার দিন গেল, তাহার পর আরও দুই দিন গেল

চৌদ্দটাদিন সাধুর আহার হইল না এ কি সম্ভব ? চৌদ্দ দিন না খাইয়া কি মানুষ বাঁচিতে পারে ? সাধারণ মানুষ বোধ হয় পারে না, দুই তিন দিন আহার না হইলেই সংসার অগ্নিময় বোধ হয়, চতুর্দ্দিকে সরিষা ফুল দৃষ্ট হয়, দৃষ্টি শক্তি দূর হয়, শ্রবণে অবিরত ঝাঁজ ধ্বনি

শু , আর চৌদ্দটা দিন, অসম্ভব্‌ —সাধারণ মানুষের পক্ষে ১৪ দিন অনাহারে থাক অসম্ভব ও জীবন ধারণ অসম্ভব

কিন্তু এ সাধু সম্বন্ধে এ বিধান খাটে না। তিনি সাধন সময়ে দিন-এয়ান্তে অন্ন গ্রহণ করিতেন; এখন সিদ্ধি লাভে সতত হরিপ্রেমসুধা পানে বিভোর, এখন অন্নাহার বর্জ্জনে তাঁহার দেহ বিকল হইল না, প্রাণ দেহ ছাড়িয়া গেল না সকলেই দেখিল যে চৌদ্দ দিনের অনাহারেও তিনি বাঁচিয় আছেন ইহা তো আর বেশী দিনের ঘটনা নহে ;—ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে এখনও জীবিত বহু লোক বর্ত্তমান আছেন চতুর্দ্দশ দিবসে গ্রামের বহুলোক মনোমোহিনী গৃহে গেলেন। গ্রামের লোকের ভয় হইল, বুঝিবা শেষে খুনের দায়ে গ্রাম শুদ্ধ লোক বিপদে পড়েন

কেবল ভয় নহে, এরূপ একজন নিরীহ সাধু অনাহারে মরিতে বসিয়াছেন, ইহা কে সহিতে পারে? এক্ষণে গ্রামের সব লোকই সাধুর পক্ষপাতী মনোমোহিনীর পুত্রগণও এ অদ্ভুত কাণ্ডে বিস্মিত সকলেই গিয়া মনোমোহিনীকে ধরিয়া বসিল, মনোমোহিনী এবার আর "না" বলিতে পারিলেন না বলিলেন "আগামী কল্যই আমি গিয়া খাওয়াইব।'

পঞ্চদশ দিবসের প্রাতঃকালেই মনোমোহিনী স্নান করিয়া সাধুগৃহে আসিলেন এবং স্বয়ং পাক করিয়া কিছু আহার করতঃ, সাধুকে প্রসাদ দিলেন চৌদ্দ দিনের পর সাধুর সেই খাওয় হইল

সাধুর গুরুসেবায় এইরূপ দার্ঢ্য দৃষ্টে গ্রামের লোক চমকিত হইল, —সকলেই গুরুভক্তি ও প্রসাদে নিষ্ঠা কি বস্তু তাহা দেখিল এই সময় হইতে মনোমোহিনীও কিছুদিন শান্তভাব ধারণ করিলেন কিছু দিন নিরাপত্যে সাধুর গুরুসেবা চলিল যেন জগদগুরুই এই উপলক্ষে এইরূপে জগৎকে দেখাইলেন যে গুরুকৃপা সহজলভ্য নহে, গুরুকৃপা

পাইতে হইলে কিরূপ নিষ্ঠা আবশ্যক কঠোর সাধন বিনা সিদ্ধি লাভ ঘটে না।

ভিক্ষায় রহস্য প্রকাশ।

বর্ষার উচ্ছ্বাসময় স্রোত একধারা চলিয়া যায়, মধ্যে যদি স্রোত বাধা প্রাপ্ত হয়, সে বাধায় স্রোতের কোন হানিই হয় না, বেগ বরং বর্দ্ধিতই হয়

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর কয়েক দিন মনোমোহিনী কোন কথাই বলেন নাই সাধু তিনবার করিয়া প্রত্যহ গুরুগৃহে যাইতে লাগিলেন

মনোমোহিনীর মনে কি ভাব ছিল বলা যায় না, কিন্তু সাধুর প্রতি তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহারে তাঁহাকে সাধুর ন্যায় উন্নত-চেতা বা উচ্চস্তরের বলিয়া বোধ হইত না যদিও তিনি অপর প্রতিবেশিনী হইতে নানাগুণে আদর্শস্থানীয়া ছিলেন

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই পুনঃ তিনি সাধুর প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন তিনবেলা সাধু তাঁহার গৃহে আগমন করেন, ইহাতে তিনি বিরক্ত হন অথবা লজ্জা অনুভব করেন এবং সাধুকে ভর্ৎসনা করেন, যাইতে নিষেধ করেন এমন কি, কোন দিন প্রহার পর্য্যন্ত করিতে দেখা গিয়াছে কিন্তু সাধুর বদনে তাহাতে কোনরূপ বিরক্তি বা বৈমুখ্য অথবা বিকার ভাব লক্ষিত হয় নাই নির্ব্বিকার সাধু গুরু সদনে সদা যেন অপরাধীর ন্যায় যেন চোরের ন্যায় অবস্থিতি করিতেন

মনোমোহিনীর সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হইল, কোন রূপেই সাধুকে নিরস্ত

করিতে পারিলেন না আর একদিন তিনি মনে করিলেন যে সাধুকে কোন রূপেই দর্শন দিবেন না সেদিন সন্ধ্যাবেলা সাধু যেমন প্রণাম করিতে আসিবেন, অমনি তিনি দোয়ার বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলেন

সাধুর সেদিন আর নির্দ্দিষ্ট গুরু প্রণাম করা হইল না, সাধু নিরুপায় হইয়া বাহিরে বারান্দার ধারে বসিয়া রহিলেন এইরূপে এক প্রহর রাত্রি অতীত হইল, গৃহের ভিতরে গুরু, আর গৃহের বাহিরে শিষ্য, দুজন দুখানে আপন মনে বসিয়া রহিয়াছেন

এমন সময় পুত্র নিত্যানন্দ বাড়ী আসিলেন, নিত্যানন্দের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিত্যানন্দ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন, নিত্যানন্দ সাধুকে শ্রদ্ধাও করিতেন তিনি আসিয়াই সাধুকে বাহিরে দেখিলেন ও দোয়ার খুলিয়া দিতে মাকে ডাকিলেন

পুত্রের আহ্বানে মা দ্বার খুলিয়া দিলে, পুত্র গৃহে গেলেন এবং সেই সঙ্গে সাধুও হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন

এদিকে মা পুত্রকে আদেশ দিলেন, "ইহাকে বাহির করিয়া দাও" শ্রদ্ধাভাজন সাধুকে তাড়াইয়া দিতে নিত্যানন্দ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, শেষে মাতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য তাঁহাকে কোড়ে করিয়া বাহিরে রাখিয়া আসিলেন

ছিন্ন কন্থাচ্ছাদিত দেহে সাধু সে রাত্রি সেই গৃহ প্রাঙ্গণেই মশকবেষ্টিত হইয়া উপবেশন করিয়া কাটাইলেন সে রাত্রে প্রকৃতি দেবী, শান্ত ছিলেন না, একটা প্রবল ঝড় বৃষ্টি তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া গেল প্রভাত হইলে মনোমোহিনী দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন, বৃষ্টি স্নাত সাধুও তখন উঠিয়া গুরুপ্রণাম পূর্ব্বক চলিয়া আসিলেন

মনোমোহিনী প্রায়শঃ এইরূপ অত্যাচার করিতে লাগিলেন, সাধুর তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ যদিও ছিল না, কিন্তু তাহার ভ্রাতৃদ্বয়ের মনে বড়ই

দুঃখ জন্মিত তাঁহারা তাতে আর সাধু নহেন, দোষলেশশূন্য তাঁহাদের ভ্রাতার উপর অযথা অত্যাচার হইত, ইহা তাঁহারা সহিতে পারিতেন না।

এদিকে মনোমোহিনী অযথা অত্যাচার করিতে থাকিলে সাধু ভাবিলেন, 'গুরুর এ ব্যবহার অবশ্যই নিজের শোধন জন্য, অবশ্যই সেবায় কোনরূপ ত্রুটি হইতেছে, এবং সেই জন্যই গুরুর এই ব্যবহার।'

তিনি তখন ভ্রাতৃ-অন্নে গুরুর সেবা করা উপযুক্ত নহে বলিয়াই অবধারণ করিলেন এবং কিরূপে ভ্রাতৃ অন্ন বর্জ্জন করিবেন তাহারই বিষয় মনে করিতে লাগিলেন।

তাঁহার গুরুকে যে অন্ন নিবেদন করিবেন, তাহা শুদ্ধ অন্ন হইবে কিন্তু যে কারণেই হউক, এই সময়ে মনোমোহিনীকে অন্ন নিবেদন তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের মনঃপূত ছিল না। এরূপ অনিচ্ছাদত্ত অন্ন শুদ্ধ অন্ন নহে।

দেখা গিয়াছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে কেহ কোন খাদ্য উপহার দিতে গেলে, যদি সে বাড়ীর কাহারও মনে একটু শ্রদ্ধার ত্রুটি জন্মিত পরমহংস দেব তাহা বুঝিতে পারিতেন ও গ্রহণ করিতেন না। আবার কতকটা দ্রব্যের মধ্যে একটীও যদি সেরূপ দোষদুষ্ট হইত,—যদি বা অন্য কাহাকেও দিবার জন্য নাম ধরা থাকিত, তাহাও তিনি জানিতেন ও গ্রহণ করিতেন না। আমাদের সাধুও হয়ত এইরূপ কিছু মনে করিয়াছিলেন।

শ্রীদাস গোস্বামীকে তাঁহার পিতা নীলাচলে লোক দ্বারা টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই টাকা দিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীমহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। কিছুদিন পরে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীমহাপ্রভু একটী উপদেশ বাক্য বলিলেন, যথা "ভাল, রঘুনাথ ভালই করিয়াছে, বিষয়ীর অন্ন শুদ্ধ অন্ন নহে।"

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

আমাদের সাধু হয়ত এই উপদেশ পালন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকিবেন

ভক্তের ইচ্ছা ভগবান পূর্ণ করিয়া থাকেন, তাই তিনি ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু সাধুর যেমন এইরূপ ইচ্ছা জন্মিল অমনি ভ্রাতৃ-অন্ন বর্জ্জনের একটা স্থবিধা উপস্থিত হইল

একদিন তিনি প্রস্তুত অন্ন লইয়া গুরুগৃহে চলিয়াছেন, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা চন্দ্রনাথ তাহা দেখিতে পাইলেন, মনোমোহিনীর অত্যাচার জ্বালা স্মরণে তাঁহার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল, তিনি কনিষ্ঠের হস্ত হইতে প্রস্তুত অন্ন কাড়িয়া আনিলেন

সেদিন আর সেবা হইল না তৎপর দিন সাধু আর ভ্রাতৃ-দত্ত তণ্ডুলাদি গ্রহণ করিলেন না, ভিক্ষার্থ গ্রামে বহির্গত হইলেন ভ্রাতৃদ্বয় হায় হায় করিয়া উঠিলেন, তাঁহাদের ইহা সহ্য হইল না, কিন্তু সাধু কিছুই শুনিলেন না, ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলেন এবং প্রথমেই সেই তরফদার-গৃহে উপস্থিত হইলেন

তরফদার গৃহের পরীক্ষান্তেই সাধুর "সাধু" নাম প্রকাশ হয়, আবার এক্ষণে তরফদার গৃহ হইতেই প্রথম "ভিখারী" নাম প্রকাশ পাইল ।

অবাক্ ভিখারীর অবাক্ যাচ্ঞা হাতে একটি ঘটি, এটিই ভিক্ষা-পাত্র ; তরফদার-গৃহে উপস্থিত হইয়া এটিই স্থাপন করিলেন ।

তরফদার অভিপ্রায় বুঝিলেন ও শ্রদ্ধাসহকারে সেই লোটা পূর্ণ করিয়া তণ্ডুল দিলেন তারপর সাধু আর দুই তিন বাড়ী গেলেন বহু তণ্ডুল ও তরি তরকারি একত্রিত হইল ; তিনি চলিয়া আসিলেন, এবং তাহাই পাক করিয়া অন্ন প্রস্তুত ক্রমে গুরুগৃহে লইয়া গেলেন

আজ আর মনোমোহিনীর বিরক্তিভাবের চিহ্নও দেখা গেল না, আজ তিনি প্রসন্নচিত্তে ভোজন করিয়া প্রসাদ দিলেন বস্তুতঃ সেদিন হইতে মনোমোহিনীকে কথঞ্চিৎ প্রসন্ন দেখা যাইতে লাগিল

তদবধি এইরূপই চলিল একদিন ভিক্ষার্থ বহির্গত হন, একদিনের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি যতদিনে নিঃশেষ না হইত, ততদিন আর ভিক্ষার্থ বহির্গত হইতেন না তাহা ফুরাইলেই পুনঃ আর একদিন ভিক্ষায় বাহির হইতেন ভিক্ষাও লোকে দিত যথেষ্ট একদিনের ভিক্ষায় যাহা মিলিত, তাহাতে প্রায়শঃ একমাস চলিয়া যাইত। তাঁহার ভিক্ষার একটি বিশেষত্ব ছিল, তিনি কখনও একজনের বাড়ীতে দুইদিন ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই একজনের বাড়ীতে একবার মাত্র ভিক্ষা লইতেন তবে কেহ আগ্রহ করিয়া লইয়া গেলে স্বতন্ত্র কথা ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল হইতেও আবার প্রত্যেক ভিক্ষাদাতাকে কিছু কিছু দিয়া আসিতেন

এই সময় তাঁহার উপর কখন কখন দুরন্ত পিশাচদের অত্যাচার হইত

একদা ইটা চা বাগানে ভিক্ষার্থ গেলে, একটা দুষ্ট কুলি তাঁহাকে নিদারুণ প্রহার করিয়াছিল নির্বিকার অবাক্ সাধু তাহাকে কিছুমাত্র বাধা দেন নাই, নীরবে প্রহার সহ্য করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন সাধু তাহাকে কিছু না বলিলেও দেখা গিয়াছিল যে ৫।৭ দিন মধ্যেই আপনা আপনি ঐ কুলির অঙ্গ পচিতে আরম্ভ হইয়াছে। অবশেষে কুলির অবস্থা কি হইয়াছিল, কেহ খোঁজ করে নাই

ভিক্ষা ব্যাপারেও নানা রহস্য প্রকটিত হইতে আরম্ভ হয়

একদা বরমচাল পরগণায় ভিক্ষার্থ এক বিধবাগৃহে গিয়া দেখিতে পান যে তাহার সবজিক্ষেত্রে বাঙ্গি-চিনার নামক ফল ধরিয়া রহিয়াছে বড় ফলটি গুরুসেবার জন্য তাঁহার লইতে ইচ্ছা হইল, অমনি তণ্ডুল ভিক্ষা না নিয়া সেই ফলবতী লতিকা-মূলে গিয়া ভিক্ষাপাত্র ধারণ

করিলেন বিধবা ছোট ফলটি দিতে চাহিল, তিনি ইঙ্গিতে দেখাইলেন যে, সেবায় ভাল দ্রব্য দিতে হয় বিধবা তাহা না শুনিয়া চলিয়া গেল এক্ষণে, সেই বিধবার সর্ব্বনাশ হউক, ইহা ইচ্ছা নহে, তাই তিনি চলিয়া না আসিয়া সেই লতা মূলেই বসিয়া রহিলেন সন্ধ্যা সমাগত হইল, এমন সময় অন্য বাড়ীর একটি স্ত্রীলোক আসিয়া সাধুকে তদবস্থায় দেখিল ও বিষয় অবগত হইয়া বিধবাকে মিষ্ট ভৎর্সনা করিয়া ফলটি সেবার জন্য দেওয়াইল সাধু ফল লইয়া রাত্রিতে প্রায় দশ মাইলের পথ চলিয়া আসিয়া নিয়মিত সেবা সম্পন্ন করিলেন

* * * *

চিন্তানাথ নামে গ্রামের এক ব্যক্তি যন্ত্রে ইক্ষু পেষণ পূর্ব্বক রস সংগ্রহ করিতেছে রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই ইক্ষু পেষণ আরম্ভ হয় সাধুর রাত্রিতে ঘুম তো একরূপ নাই; সেবায় রস দিবেন ইচ্ছা হওয়ায়, একদিন প্রত্যূষে উক্ত চিন্তানাথের ইক্ষু পেষণ স্থলে উপস্থিত হইয়া হাতের ঘটি যন্ত্রসন্নিধানে রাখিয়া দিলেন চিন্তা-নাথ রস ভিক্ষা দিল না, পরন্তু বহু কটুবাক্য বলিয়া তাড়াইয়া দিল নির্ব্বিকারচিত্ত সাধু কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া ফিরিয়া আসিলেন

চিন্তানাথের রসসংগ্রহ কার্য্য সমাপ্ত হইলে, রস জ্বালে চড়ান হইল কিন্তু আজ গুড় প্রস্তুত হইল না, পাত্র ভগ্ন হইয়া সমস্ত বিনষ্ট হইল, পরদিনও তাহার এইরূপ বিভ্রাট ঘটিল তখন তাহার জ্ঞান জন্মিল এবং মনে সঙ্কল্প করিল যে যদি আর বিঘ্ন না ঘটে, তবে সে দিন সর্ব্বাগ্রেই সাধুকে রস দিবে। তাই হইল চিন্তা তখন রস লইয়া সাধু সদনে গেল এবং নতি স্তুতি সহকারে সেবার জন্য রস অর্পণ করিয়া আসিল

আর একদিন কৃষ্ণমোহনের বাড়ী এইরূপই রস আনিতে সাধু গেলেন কৃষ্ণমোহন ভাবিল, 'দেখি বেটা কেমন সাধু কত।

বলেন না, কিন্তু সেবার জন্য রস চাই ” সে পরীক্ষার্থ একটা জলন্ত টিকা (তামাক জ্বালাইবার অঙ্গারখণ্ড বিং) আনিয়া তাঁহার উরুদেশে রাখিয়া দিল টিক জ্বলিতে লাগিল, সাধুর বদনে একটু মাত্র ভাবান্তর লক্ষিত হইল না এ সহিষ্ণুতা কি মানুষে সম্ভবে ? এরূপ সহিষ্ণুতার কথা তো শুনা যায় নাই ?

ভক্তরাজ প্রহ্লাদের অঙ্গে অগ্নি শীতল স্পর্শ হইয়াছিল এ সাধুর অঙ্গস্পর্শে অগ্নির এরূপ গুণ ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল বলিতেছি না, কিন্তু এমন সহিষ্ণুতার উদাহরণ দ্বিতীয় দেখা যায় না কৃষ্ণমাহারা যেমন ভীত হইল, তেমনই তাহার মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইল, সে তাড়াতাড়ি জলন্ত টিকা উরু হইতে উঠাইয়া লইল ও প্রণাম করিয়া ঘটি পূরিয়া রস দিয়া সাধুকে বিদায় দিল

* * * *

আর একদিন প্রহরেক দূরবর্তী অস্তেহরি গ্রাম হইতে ভিক্ষান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। একটি প্রান্তর পার হইবা আসিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে তাঁহার পাছে পাছে সে গ্রামবাসী আরও কয়েকটী লোক আসিতেছিল তাহাদের মনে হইল যে ‘এ বেটা চোর, নতুবা এ সময়ে একা মাঠে কেন ? তাহারা চোর অনুমানে সাধুকে ধৃত করিতে ধাবিত হইল, ক্রমে দৌড়িল, কিন্তু সাধুকে ধরিতে পারে না প্রথমে যত দূরে দেখিয়াছিল, দৌড়িয়া ধাবিত হওয়ার পরেও সাধু তত দূরে! তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া অগ্রধাবনে ক্ষান্ত হইল, ও ব্যাপার কি, বুঝিবার জন্য একটু ভীতচিত্তে দাঁড়াইল সবিস্ময়ে তাহারা তখন দেখিল যে একটা অগ্নিস্তম্ভ ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। তাহারা ভীত হইয়া দৌড়িল কিন্তু পরেই সাধুর কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল

উন্মত্তালাপ

"পাতের উপর পড়ে পাত,
বুঝি এল প্রাণ নাথ"

শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন কুঞ্জ সুসজ্জিত, কৃষ্ণ কিন্তু আসিতেছেন না শ্রীমতী জিজ্ঞাসিতেছেন, "সখি! তবে কি বঁধু এলেন না?" সখীরা প্রবোধ দিতেছে; ক্রমে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইল শ্রীরাধা উঠি বসি করিতে লাগিলেন।

একদিন সাধুর এই রূপই অবস্থা হইল। কেহ কথা বলিতেছে, অমনি উৎকর্ণ হইয়া বাহির হইতেছেন, এবং পুনঃ গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না কি শুনিয়া যেন উঠিলেন, বাহিরে আসিলেন ও গুরুগৃহ পানে ধাইলেন তথায় গিয়া দেখেন যে মনোমোহিনী গৃহের বাহিরে আসিয়াছেন

সাধু তাঁহার সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলেন। বাহ্যজ্ঞান নাই, অভ্যাস বশে যথানির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়া বসিয়া রহিলেন প্রায় একঘণ্টা এরূপ বসিয়া রহিলেন এদিকে সেবার সময় অতীত প্রায়, গুরু শিষ্যকে বার বার স্মরণ করিয়া দিতেছেন, কিন্তু আত্মস্মৃতিবিহীন সাধুর কিছুতেই বাহ্যজ্ঞান হইল না।

মনোমোহিনী সাধুকে তদবস্থায় রাখিয়া নিজে গৃহে পাকাদি করিতে চলিলেন ও পাক সমাধা করিয়া আসিলেন সাধু তখনও তদবস্থ হয়ে তথায় উপবিষ্ট, তখন পর্য্যন্ত আত্মবিস্মৃত ও বাহ্যবিরহিত মনোমোহিনী আহার করিলেন ও প্রসাদ দিলেন, সাধু অভ্যাস বশে দুই চারি গ্রাস খাইলেন কিন্তু ভাবের নিশা ছুটিল না, বাহ্য জ্ঞান ফিরিল না এই একই ভাবে তিন দিন গত হইল।

মনোমোহিনী শিষ্যকে গৃহে যাইতে কত বলিলেন, কত প্রবোধ দিলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কত অত্যাচার করিলেন, তাহাও তাঁহার যেন অনুভব হইল না। শেষে অসমর্থ হইয়া তৎপর দিন তিনি তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া চলিলেন ও তদীয় গৃহে উপনীত হইয়া বলিলেন "আজ হইতে তোমার গৃহে আসিয়া আহার করিয়া যাইব, তোমাকে আর তথায় যাইতে হইবে না।" সাধু যেন তাহাতেই প্রবুদ্ধ হইলেন।

সেদিন হইতে মনোমোহিনী শিষ্যগৃহে আসিয়াই আহার করিতে লাগিলেন।

একদিন মনোমোহিনী নিজে গৃহেই পাক করিবেন ইচ্ছা করিয়া শিষ্যকে তাহা জানাইলেন। তৎশ্রবণে সাধু ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন যে, যেন ১২।১৩ জনের উপযোগী অন্ন পাক হয়। কেন এত অন্নের আবশ্যক কি? বার বার ইহা জিজ্ঞাসিলেও ইঙ্গিতে কিছুই বুঝাইলেন না। যাহা হউক, পাকান্তে মনোমোহিনী কিঞ্চিৎ খাইলেন ও অবশিষ্ট ৬।৭ জনের উপযোগী প্রসাদ রাখিয়া বলিলেন, "সবই খাইতে হইবে, প্রসাদ ফেলিতে নাই, প্রসাদ ফেলিতে পারিবে না।" সাধু খাইতে বসিলেন ও সেই ৬।৭ জনের উপযোগী অন্নরাশি কিছু মাত্র না রাখিয়া সমস্তই খাইলেন। ইহাতেও যেন তাঁহার পেট ভরে নাই। পেটে হাত দিয়া ইঙ্গিতে তাহা প্রকাশ করিলেন, মনোমোহিনী সাধুর মহিমায় বিস্মিতা এবং অনেকটা লজ্জিতা হইলেন বলা বাহুল্য।

এরূপ ঐশ্বর্য্যভাব সর্ব্বত্রই সময় সময় সিদ্ধ মহাত্মাদের চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্যজনক কিছু নাই; কিন্তু যখন এই সাধু সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইতেন, যখন সংকীর্ত্তনে তাঁহার ভাবোদয় হইত, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হইত, কখন কখন নৃত্যাবেশে জ্ঞানশূন্য হইতেন, দেহে নানা সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পাইত

এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল যে সময় হইতে বাক্য বন্ধ ঘটিয়াছিল, তখন হইতে দ্বাদশ বর্ষ অতীত, বারটী বৎসর সাধু কথা কহেন নাই,—বলিবার শক্তি বিলোপ হইয়া গিয়াছিল অন্তরে সর্ব্বদা নাম লইতেন, বাহ্যে টক্ টক্ শব্দে তাহার প্রতিক্রিয়াজাত প্রতিধ্বনি হইত কদাচিৎ কীর্ত্তনাদিতে হুঙ্কার মাত্র করিতেন, কিন্তু বাক্যোচ্চারণের শক্তি ছিল না

দ্বাদশ বর্ষান্তে একদিন সাধু ভাবাবেশে গুরুগৃহে গিয়াছেন বাহ্যজ্ঞান নাই অভ্যাস বশতঃ যথানির্দ্দিষ্ট বসিবার স্থানে গিয়া বসিলেন গুরু প্রতি আবেশভাবে একবার চাহিলেন পরে হঠাৎ তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল

গুরুর প্রশ্নে শত দিন চেষ্টায় উত্তর দিতে যিনি সমর্থ হন নাই, কৃষ্ণ মাহাবার জাগি পরীক্ষায়ও 'উঃ' শব্দটি করিতে পারেন নাই, কিন্তু আজ বার বৎসরের পর আবেশাবস্থায় আপনা আপনি সে অবাক্ ব্যক্তির বাক্য স্ফুরিত হইল সাধু অনর্গল কথা বলিতে লাগিলেন

সে কি কথা কেহ বুঝিতে পারিল না, সে কি ভাষা, তাহা কেহ জানে না যেন দুজন লোক পরস্পর কথা কহিতেছে

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা এইরূপ অজ্ঞানাবস্থায় অনর্গল কথা কহিলেন, যেন পাগলের প্রলাপ অর্দ্ধ ঘণ্ট পরে হঠাৎ জ্ঞান লাভ করিলেন তৎক্ষণাৎ সেই উন্মত্ত প্রলাপ স্থগিত হইল, তখন আবার বাক্য বন্ধ হইয়া গেল, তালুমূলে পূর্ব্ববৎ টক্ টক্ বাজিতে লাগিল

মনোমোহিনী বিস্মিতচিত্তে জিজ্ঞাসিলেন, ব্যাপার কি? ব্যাপার কি -নিজে সাধুও বুঝিতে পারেন নাই, তিনি আর কি উত্তর দিবেন? কাজেই কিছু ইঙ্গিতেও বুঝাইতে পারিলেন না।

তখন হইতে মধ্যে মধ্যে এইরূপ হইতে লাগিল, কখন কখন সংকীর্ত্তনে ভাবাবেশ উপস্থিত হইলেই বাহ্য স্মৃতি বিলোপের সহিত

এইরূপ অশ্রুত-পূর্ব্ব ভাষায় উন্মত্ত প্রলাপ আরম্ভ হইত এ আলাপ বাক্য মধ্যে কখন কখন ২৷১টী বাংলা কথাও স্থান পাইত, এইরূপে বাংলা ভাষাও বলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু বাহ্যজ্ঞান হইলেই বাক্য-কথন শক্তি লোপ পাইত।

এই সময়েও ভিক্ষায় যাইতেন, ভিক্ষার রীতি পূর্ব্বে বলিয়াছি। একদিন একবারের অধিক দুইবার কাহারও বাড়ীতে ভিক্ষার্থ যান নাই একস্থানে কিন্তু তাঁহার এ রীতি ভঙ্গ হইয়াছিল

ক্ষেমসহস্রের উত্তরে বাঙ্গালি বলিয়া এক গ্রাম আছে, সেই গ্রামে এক বৃদ্ধা মুসলমানীর বাস বৃদ্ধার তিন পুত্র, তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্মে মতিমান, বৃদ্ধাও ধর্ম্মানুরক্তা। এই বৃদ্ধার কাছে আজ ভিখারী বেশে সাধু উপস্থিত

বৃদ্ধার উপদেষ্টার শিক্ষা এই যে নিরুপায় ধার্ম্মিক ব্যতীত ভিক্ষা দিবেনা নানা অলস লোক ভিক্ষায় অর্থ সংগ্রহ করতঃ অসদ্ব্যয় করে, ইহাতে দাতার অশুভ হয় কাজেই কাহাকেও বৃদ্ধা বিনা পরীক্ষায় ভিক্ষা দেয় না।

সাধু বৃদ্ধার দ্বারে দাঁড়াইলেন; কিন্তু ভিক্ষা মিলিল না—ফিরিয়া আসিলেন আর এক দিন সাধু ঐ বৃদ্ধার গৃহে ভিক্ষার্থ গেলেন, এ দিনও ফিরিয়া আসিতে হইল।

ঐ রাত্রে বৃদ্ধা এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিল, সেই স্বপ্ন-বিবরণ সে কাহারও কাছে তখন বলিল না, কিন্তু মনে মনে সাধুকে স্বীয় গুরুস্বরূপ বলিয়া বুঝিয়া রাখিল

আর একদিন সাধু সেই বৃদ্ধার গৃহে উপনীত। সেদিন বৃদ্ধা সাধুকে যত্নে বসাইয়া বলিল—"সাধু, তুমি আমার মুরশিদ (গুরু), স্বপ্নে আমার মুরশিদ আমাকে দর্শন দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে তিনিই তোমার রূপ ধরিয়া দয়া করিয়া আসিয়াছেন"

বৃদ্ধার পুত্রগণ তখন সাক্ষাতে মাতৃমুখে এই বাক্য শ্রবণে সাধুর প্রতি তাহাদেরও শ্রদ্ধা জাত হইয়াছে বৃদ্ধ তখন বহু পরিমাণে তণ্ডুল ও ডাল তরকারী প্রভৃতি উপহার দিল এবং নিজ পুত্রদ্বারা বহাইয়া সাধু-গৃহে লইয়া আসিল

এই বৃদ্ধা তাহার পর আজীবন সাধুকে গুরুরূপে শ্রদ্ধা করিয়াছে সে মধ্যে মধ্যে গুরুগৃহে গুরু দর্শনে আগমন করিত সাধুর গৃহ তখন জনসাধারণের কাছে "আখড়া" নামে খ্যাত হইয়াছে।

আর একদিন বৃদ্ধা গুরুদর্শনে আখড়ায় গিয়া দেখিতে পাইল যে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে, তথাপি গুরুর খাওয়া হয় নাই এদিকে মধ্যাহ্নভোজনের পরেই সে গুরু দর্শনে গিয়াছিল এযাবৎ গুরুর আহার হয় নাই দেখিয়া সে খেদে বলিতে লাগিল, "আহা মুরশিদের আহারের আগে আমার আহার হইয়াছে, কি কষ্ট আজ হইতে আর দিবাতে অন্ন গ্রহণ করিব না, সন্ধ্যার আগে অবশ্যই এক সময় মুরশিদের আহার হইয়া যাইবে" তদবধি বৃদ্ধা আর দিবাভাগে খাইত না, প্রহরেক রাত্রির পর একবার মাত্র খাইত।

এই ঘটনার সাত বৎসর পর একদা বৃদ্ধা নানা দ্রব্যসহ আখড়ায় আসিয়া গুরুদর্শন ও প্রণাম করিয়া গুরুর আশীর্বাদ লইয়া গৃহে গিয়াছিল এবং তৎপর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছিল

আবেশ ভাব

এই যে যবনী বৃদ্ধা আখড়ার দালচাল ইত্যাদি আনিয়া দিয়াছিল এই হইতে সাধুকে আর ভিক্ষার্থে বাহির হইতে হয় নাই, লোকে আপনা আপনিই দ্রব্যাদি আনিয়া সেবার তরে যোগাইত সাধু বড় বাহির হইতেন না, তখন গ্রামের লোকই সাধু দর্শনে আখড়ায় আসিত আখড়াতেই কীর্ত্তন হইত আখড়াতেই কীর্ত্তনে বহু লোকের ভাব হইত, সাধুও সময় সময় আবেশ ভরে উন্মত্তালাপ করিতেন এবং ভক্তগণ তাহাতে নানা ভাবের স্ফুরণ হইতে দেখিত তখনও মধ্যে মধ্যে উন্মত্তালাপ চলিত, যেন দুই ব্যক্তি পরস্পর কথা কহিতেছে

এ উন্মত্তালাপ কি ? সাধুর আবেশই বা কি ? সচরাচর আমরা লোকের ভূতাবেশ হইতে দেখি যাহার উপর আবেশ হয়, সে জ্ঞান বশে থাকে না, পাগলপ্রায় নানা কথা কহে, তখন রোজা ডাকিয়া "হাজিরাত" বা বৈঠক করাইয়া আবেশিত ব্যক্তিকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে নিজ নাম না বলিয়া কোন মৃত ব্যক্তির নাম বলে ও কেন সে এই আবেশিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়াছে, কিরূপে ছাড়িয়া যাইবে, কিরূপে তাহার মুক্তি হইবে, তাহা বলিয়া দেয় ইহাতে দর্শক বুঝে যে মৃত্যুর পর পাপ বশে যাহাদের উদ্ধার হয় না, তাহারাই এইরূপে লোক সমাজে আসিয়া নানা উৎপাত করে।

আত্মা ধ্বংসরহিত, শাস্ত্র ইহা বলেন * বিজ্ঞান বলেন যে, এই সৃষ্টিরাজ্যে কিছুরই লয়োদ্ভব নাই যাহা থাকিবার, আদি হইতেই তাহা

---

* "অবিনাশীতু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ " ইতি গীতা

আছে এবং থাকিবে, কিছুই বিলুপ্ত হইবে না। তবে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। আজ যে জড় পরমাণু জীবদেহরূপে রূপবৈচিত্র্য বিকাশে ভূতলে বিচরণ করিতেছে, কালে তাহা বৃক্ষরূপে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু বিনষ্ট হইবে না।

ঐ যে পিঞ্জরাবদ্ধ শুক যাহাকে যত্নে কথা বলিতে শিখাইতেছ, যাহার মুখে কৃষ্ণবুলি শুনিয়া প্রাণে সুখ অনুভব করিতেছ, উহারও আত্মা আছে। আজ সে পক্ষীদেহে বিরাজিত বলিয়া পক্ষী নামে খ্যাত, মৃত্যুর পর ক্রমোন্নতির রীতিতে—কর্ম্মের সফলতায় সে মানুষ রূপেও জন্মিতে পারে। কিন্তু তাহার ধ্বংস হইবে না। সৃষ্টিরাজ্যে ধ্বংস নাই।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন, "এই রাজন্যগণ, তুমি এবং আমি, সকলেই পূর্ব্বে ছিলাম, আছি এবং থাকিব; সৃষ্টিরাজ্যে ধ্বংস নাই।"

মৃত্যুর পর কাজেই ধ্বংস বিনাশশূন্য আত্মা পরলোকে যথাস্থানে অবস্থিতি করেন। সংসার বাসনা যাহাদের প্রবল এবং জড় সম্বন্ধ যাহাদের মন হইতে ঘুচে নাই, তাহারাই বাসনার আকর্ষণে নিজ প্রকৃতির অনুযায়ী ব্যক্তি দেহে আবির্ভূত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই অবস্থার নাম ভূতাবেশ। কাজেই তখন আবেশিত ব্যক্তিকে নাম জিজ্ঞাসিলে সে নিজ নাম না বলিয়া অন্য নামে পরিচয় দেয়।

ইহার কারণ, তখন তাহার দেহ তাহার বশে নহে, দেহ তখন সেই আবির্ভূত আত্মার বশে। নিজ দেহস্থিত আত্মা তখন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়া থাকে, দেহাশ্রিত আগন্তুক আত্মাই যেন তখন দেহের মালিক।

বাসনাযুক্ত আত্মা ক্রমশঃই এইরূপ লোকের দেহ আশ্রয় করিয়া নানা উৎপাতের কারণ হয়। কিন্তু যাঁহাদের বাসনা নাই, যাঁহারা

মহাত্মা, বাসনার অভাব প্রযুক্ত এবং জ্ঞান প্রভাব হেতু তাঁহারা এই-রূপে জীবিত লোকের দেহাশ্রয় করিতে আগ্রহ করেন না। তবে ভগবৎ শক্তি প্রেরিত হইয়া বা মহাত্মাদের নির্দেশানুসারে কখন কখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থ, তাঁহাদিগকেও কোন সাধু ব্যক্তির শুদ্ধদেহে আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। ইহারই নাম আবেশ। এই রূপ পবিত্র দেহে দেবাবেশও হইতে পারে।

বর্ত্তমানে আত্মিকতত্ত্বালোচনার সহিত লোকের কাছে ইহা ক্রমশঃ পরিচিত হইতেছে। এমন কি পরলোক সম্বন্ধে অনেকেই বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় আমরা এই আবেশ তত্ত্বের বিশেষ উদাহরণ পাই।

শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, পরে তিনি নবদ্বীপে গমন করেন। তিনি শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে একত্র অল্প কিছুদিন পড়িয়াছিলেন ও পরে একজন প্রধান পার্ষদ মধ্যে গণ্য হন। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার আদি গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিত তিনিই প্রণয়ন করেন।* এই মুরারি গুপ্তের দেহে শ্রীহনুমানের আবেশ হইত, তখন তিনি অতিরিক্ত শক্তি সমন্বিত বীরম্মন্য হইতেন। যে জগাই মাধাইয়ের ভয়ে নবদ্বীপ থরহরি কাঁপিত, সর্ব্বপ্রথম প্রভুর আদেশে এই মুরারি আবেশাবস্থায় সেই জগাই মাধাই ভ্রাতৃদ্বয়কে দুই কক্ষে করিয়া প্রভুর বাড়ী আনিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীকবিকর্ণপুর কর্ত্তৃক শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থ রচিত হয়। শ্রীচৈতন্য পার্ষদ এই কবি ইহাতে গৌর পার্ষদগণের কাঁহার দেহে কাঁহার ভাব বিকাশ পাইত, তাহা লিখিয়াছেন।

এই যে সাধু আবেশাবস্থায় অজ্ঞাত ভাষায় কথা কহিতেন, যাহা

* কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস ঠিকানা হইতে এই অমূল্য শ্রীচৈতন্যচরিত প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বয়ং বুঝিতেন না, তাহা কি তাঁহার দেহাবিভূর্ত ভিন্ন ভাষাভাষী কোন মহাত্মার উক্তি? কে বলিবে, তাহা কি? কিন্তু তাহা যে নিরর্থক শব্দ মাত্র নহে, তাহা যে কোন ভাষা হইতে পারে, ইহা সময়ান্তরে তাঁহার মুখেই শুনা গিয়াছিল নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ শ্রীল দেবেন্দ্রবাবু (জয় নিতাই) একদা স্বয়ং ইহা শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং ইহা প্রাকৃত হিন্দী ভাষা বলিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন

যাহা হউক, উন্মত্তালাপে মধ্যে মধ্যে বাংলা ভাষাও থাকিত এইরূপ বাক্যস্ফূর্ত্তি হওয়াতে পরে সাধুর কথা কহিবার শক্তি পুনরাগত হয় এবং তিনি পূর্ব্ববৎ সাধারণের সহিত আলাপ করিতে সমর্থ হন দ্বাদশ বৎসর বাক্যবন্ধের পর এইরূপে আলাপ স্ফুরিত হইয়াছিল

তখন যাঁহারা প্রায়শঃ আখড়াতে যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই জীবিত আছেন ইহাঁদের মধ্যে সেই গ্রামবাসিনী অম্বিকাদাসী ও তাঁহার কন্যা ইন্দ্রমণি প্রধান এই ইন্দ্রমণি বর্ত্তমানে আখড়াতেই আছেন আর এক জনের নাম শ্রীগোপালকৃষ্ণ দত্ত, ইনিও সস্ত্রীক আখড়াতেই বর্ত্তমানে অবস্থিতি করিতেছেন আর এক ব্যক্তির নাম আলোকরাম চন্দ্রবৈদ্য, এই ব্যক্তিও বহুদিন সাধন করিয়াছিলেন, ও তদবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়

সাধুর আবেশাবস্থায় নানা ভাব প্রকাশ হইত মহেশ্বরী নামে এক বৃদ্ধা সাধুর কৃপায় ভক্তিমতী হইয়াছিলেন সংকীর্ত্তন কালে সাধু একদা আবেশ ভাবে তাঁহাকে "মা, ননী দাও" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন মহেশ্বরী জীবিতা আছেন

* * *

ক্ষেমসহস্রের নিকটেই মহাসহস্র গ্রাম, এই গ্রামে বহুতর সাম্প্রদায়িক বিপ্রের বাস তারাসুন্দর ভট্টাচার্য্য নামে একজন শক্তি-উপাসক সাধুকে পরীক্ষার্থই বোধ হয়, মদ্য পান পূর্ব্বক সাধুর আখড়ায়

গিয়া "জয় দুর্গা শিব" রবে বিহ্বল ভাবে সাধুকে ধরিতে ধাবিত হইলেন

"জয় দুর্গা শিব"—দুর্গাসাধুর অকস্মাৎ আবেশ হইয়া গেল, তিনি "বম্ বম্" রবে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন তদীয় নেত্র-তারা উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইল চমকিত চিত্তে সকলে চাহিয়া দেখিল যে, তদীয় দেহ ধবংকার ধারণ করিয়াছে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা এই ভাবে নর্ত্তনাদি করি-লেন তারাসুন্দর শিবস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, কেহ বা বিল্বদল আনিয়া, কেহ বা পুষ্পাদি আহরণ করিয়া অঞ্জলি দিতে লাগিল

তারাসুন্দর তদবধি প্রায়ই সাধুদর্শনে আখড়ায় আসিতেন

* * *

শ্রীহট্টস্থ মান্দারকান্দি পরগণা ইটা হইতে প্রায় এক দিনের পথ মান্দারকান্দির কয়েকজন স্ত্রীলোক ও পুরুষ, ইটার কদমহাটাস্থ প্রসিদ্ধ কালী দর্শনে আসিয়া ক্ষেমসহস্র গ্রামে তাহাদের কুটুম্ব গোপালকৃষ্ণ দত্ত ও ইন্দ্রমণিদের বাড়ীতে সেরাত্র অবস্থিতি করেন

সাধু দৈবাৎ সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলে যাত্রীগণও তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইল সাধু কখন কখন এ বাড়ী উপস্থিত হইয়া অম্বিকা সহ কথাবার্ত্তা কহিতেন সাধুর অনুসঙ্গে ভক্তগণও উপস্থিত হইতেন ; এই দিনও ভক্তগণ তথায় গিয়াছিলেন সাধুর আগমনে অম্বিকাগৃহে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল , যাত্রীদের কেহ কেহও কীর্ত্তনে যোগ দিল কীর্ত্তন জমিয়া গেলে সাধুর তাহাতে আবেশ হইল। কীর্ত্তনীয়াগণ বিস্মিত হইয়া তখন দেখিলেন যে তদীয় গৌরবর্ণ দেহে কাল-আভা প্রকটিত হইতেছে দেখিতে দেখিতে প্রায় অর্দ্ধহস্ত পরিমিত জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, সুদীর্ঘ জিহ্বা লক্ লক্ করিতে লাগিল এবং তিনিও কালীর ভঙ্গি ধরিয়া দাঁড়াইলেন উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রই ঘূর্ণায়মান

লোহিত লোচন দর্শনে ভয়ে স্তম্ভীভূত হইল ; কেহ কেহ বা সাহস সহকারে মা মা বলিযা স্তুতি আবস্তিল

যাত্রীরা কালীর নামে যে যে দ্রব্য আনিযাছিল, তৎ তাবৎ সাধুর সদনে ভেট দিল, তাহারা আর কদমহাটায় গেল না , এখ নেই সিদ্ধমনোরথ হইল কিছুকাল পরেই আবেশ ভাব দূর হইল তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন

আর একদিন জগন্নাথাবেশে সাধুর হস্তপদাদি যেরূপ কুঞ্চিত হইযা গিয়াছিল, জনৈক দর্শককে তাহা দেখাইতে বলিলে তিনি আমাদিগকে তাহার আভাস দেখাইতে অসমর্থ হইযা বলেন "ভগবৎ কৃপা বিনা কেহ ইচ্ছা করিয়া তাহা পাবে না, হস্তপদাদি সঙ্কুচিত হইযা যেন দেহে প্রবিষ্ট হওযা এবং বদন দীর্ঘাকার ধারণ করা অসম্ভব ইচ্ছা করিযা কেহই ইহা পারিবে না "

আর একদিন অম্বিকাগৃহে হবির লোটের আয়োজন হইল সাধু তথায় আগমন করিলেন কীর্ত্তন আরম্ভে অনেকেই মাতিয়া উঠিলেন

দীননাথ দাস নামে একব্যক্তি নাচিতে নাচিতে ভূমে পড়িযা গড়াগড়ি দিতে লাগিল। সাধুর তখন আবেশ হইল। তিনি এক থালা নারিকেললাড়ু লইয়া দীননাথের বক্ষের উপর চাপিয়া বসিলেন ও তাহার মুখে এক একটি করিযা লাড়ু দিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন "এই দেখ, হবির ভোজন দেখ "

এক্ষণে, দীননাথ হরি নহে তবে 'হরির ভোজন দেখ' আবেশে ইহা বলিলেন কেন ? কৃষ্ণ প্রেমে ভক্তজন যখন উন্মত্ত হয, তখন তাহাদের দেহে প্রেমময়েরই আবির্ভাব বলা যাইতে পারে, ইহা তাহারই উদাহরণ জন্য কি না কে বলিবে ?

এইরূপে কীর্ত্তনাদিতে যখন সাধু ভাবাবেশে বিভোর থাকিতেন, তখন ভক্ত বা সাধারণ জন সাধুর পদস্পর্শ করিতে ও ধূলি লইতে সমর্থ

হইত, অন্য সময়ে এইরূপ কার্য্যে কাহারও সাধ্য ছিল না এই জন্য সাধুর ভাবাবেশ তাহাদের কাছে বড়ই সুখজনক ছিল আবেশাবস্থায় কাহাকেও কোন কথা বলিলে, কি রুগ্ন ব্যক্তিকে মৃত্তিকাদি দিলে তাহা সফল হইত ; অন্য সময়ে কাকুতি মিনতিতেও তাহা মিলিত না

একদা মনোমোহিনীর পুত্র নিত্যানন্দের জ্বর হয়, জ্বর মারাত্মক হইল , একদিন মৃত্যু লক্ষণ দৃষ্ট হইল, রোগী ছট ফট করিতে লাগিল। আসন্ন মৃত্যু অবধারণে আত্মীয় স্বজন অন্ত্যেষ্টির আয়োজন করিতে লাগিল

মনোমোহিনী ব্যাকুল হইয়া শিষ্যকে ডাকিলেন। গুরুবাক্য শ্রবণেই সাধুর আবেশ হইল, তিনি বীরদাপে আরক্তলোচনে চলিলেন এবং গিয়াই বলিতে লাগিলেন ;—

"রাবণ পালাও, লঙ্কা ঘিরে রঘুনাথ।"

দশবার এই কথা উচ্চারণ করিয়া তিনি রোগীর পার্শ্বে বসিলেন কি আশ্চর্য্য কাণ্ড, এত যে অঘোর জ্বর, তাহা যেন নিমিষে পলাইল ক্ষণপরে রোগী শয্যায় উপবেশন করিল ও সাধুকে পার্শ্বে পাইয়া প্রণাম করিল সাধুর আবেশতা দূর হইল এবং রোগীকে আরোগ্য দৃষ্টে তিনি চলিয়া আসিলেন।

তীর্থযাত্রা।

১৮১২ শকাব্দের অর্দ্ধোদয় যোগে বহু স্থানের সাধু মহাত্মা তীর্থ গমন করেন। এই যোগোপলক্ষে তিনি তীর্থ গমনের ইচ্ছা করিলেন, নানা স্থানের সাধু সমাগমে প্রতি তীর্থই তখন পবিত্রতর হইয়াছে; সাধুসঙ্গ লিপ্সু কোন্ ভক্ত এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারেন?

সাধুর তীর্থ গমন কথা প্রচারিত হইল, সাধুকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা নানা দ্রব্যাদি সহ আখড়ায় আসিতে লাগিলেন। প্রত্যহ শতাধিক লোকের যাতায়াত হয়। সমাগত সকলকেই প্রসাদ খাওয়ান হইত। সাধুর আখড়ায় পূর্ব্বাবধি একটি নিয়ম আছে। কীর্ত্তনান্তে গ্রামান্তরের ভক্ত বাড়ী যাইতে তাহাদিগকে বাড়ীতে লওয়ার জন্য বাতাসা কলা প্রভৃতি দেওয়া হইত; আখড়ায়ও সময় সময় বহু পরিমাণে কলা ও বাতাস জমা হইত ও থাকিত। ভক্তগণের আগমনে আখড়ায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইত। এক দিনকার কীর্ত্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ দিনকার কীর্ত্তনে সকলেই ভাবে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বহুলোক ক্রমশঃ যোগদান করায় এই কীর্ত্তন অবিচ্ছেদে চারিদিন চলিয়াছিল। সাধু মধ্যে মধ্যে বাহ্যজ্ঞান পাইতেন; যখন বাহ্যজ্ঞান হইত তখন পাচক দ্বারা পাক করাইয়া খাওয়ান ও তত্ত্বাবধান ইত্যাদি করিতেন, নিয়োজিত পরিচারকদিগকে কি করিতে হইবে বলিয়া দিতেন। চারি দিনান্তে সকলে বিদায় লইয়া চলিয়া যায়।

তৎপর একদিন সাধু গুরু গৃহে গিয়াছেন তথায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, কীর্ত্তনাবেশে সাধু হঠাৎ চলিলেন। অন্তরঙ্গগণ বুঝিলেন যে,

এই যাত্রাই তীর্থযাত্রা ইহা বুঝিয়া তাঁহারা তাড়াতাড়ি আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে লইলেন সাধুর সঙ্গে চলিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালিপ্রসাদ, গুরু মনোমোহিনী অলোকরাম ও তাঁহার স্ত্রী এবং মহেশ্বরী তনয়া ভাগীরথী ইন্দ্রমণির যাওয়ার সুবিধা ছিল না, কিন্তু তিনিও পাগলিনী প্রায় চলিলেন ঠাকুরের গমন কালে বিরহ কাতর ভক্তগণ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

মহেশ্বরীকে ঠাকুর মাতৃ সম্বোধন করিতেন, বৃদ্ধা মহেশ্বরী কাঁদিয়া কাঁদিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, ঠাকুরের তখন ভাবাবেশ হঠাৎ তাঁহার দিকে ফিরিয়া একখানা কুশাসন তাঁহাকে দিলেন, বলিলেন—"এই আসনের সেবা করিও, কৃষ্ণ কৃপা হইবে এই আখড়ার যাহা কিছু জমা হইবে, তাহাই সেবায় সমর্পণ করিও" মহেশ্বরী নিরস্ত হইলেন।

সঙ্গে তথাপি প্রায় ২৫ জন লোক চলিয়াছে মধ্যাহ্নে "জামুরা" নামক গ্রামে পৌঁছিয়া বিরাইরাম নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে আহারাদি করেন; এবং সন্ধ্যাকালে বালাগঞ্জ বাজারে উপনীত হন বালাগঞ্জ হইতে পূর্ব্বোক্ত কয়জন ব্যতীত অন্যান্য ভক্তগণ চলিয়া আসেন

তীর্থযাত্রা কালে সাধু স্বয়ং খাইতে খাইতে নিজ হাতে ভক্তমুখে প্রসাদ তুলিয়া দিতেন, তখন আর স্পর্শাস্পর্শে সঙ্কুচিত হইতেন না, তখন তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেলিত কৃষ্ণপ্রেম বিচার নিয়মের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছিল।

বালাগঞ্জে চারিদিন ছিলেন, তথা হইতেই নৌকায় উঠেন

আখড়া হইতে যাত্রাকালে অতি সামান্য অর্থই সম্বল ছিল, বালাগঞ্জে নৌকায় উঠিতে দেখা গেল যে লোকের প্রদত্ত অর্থে সম্বল প্রায় দুই শত টাকা জমা হইয়াছে নৌকারোহণের পর অষ্টাদশদিবসে নবদ্বীপ পৌঁছিলেন নবদ্বীপে শ্রীগৌর বিগ্রহের চন্দ্রবদন দর্শনে সাধু পুলকিত হইলেন

এই স্থানে সমাগত সাধুবর্গের কাহারও কাহারও সহিত তাঁহার আশ্চর্য্যরূপে সম্মিলন হয়।

একদা চর্ম্মাম্বরধারী এক ব্যক্তি পথে ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া দণ্ডবৎ প্রণত হন, ঠাকুর সাগ্রহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে যেন কত পরিচিত, উভয়েই কত কথা হইল।

গুণীই গুণীকে চিনে। যথার্থ চর্ম্মাম্বর পরিহিত এ সাধু কে? অনুসঙ্গীদের প্রশ্নে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ইনি পরম সাধু, বর্দ্ধমান রাজবাটীই তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস।

শ্রীনবদ্বীপ হইতে বৈদ্যনাথ ও তথা হইতে ঠাকুর গয়াধামে গমন করেন। বৈদ্যনাথে ৪।৫ দিন ছিলেন। গয়াধামে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই বিষ্ণুপদে পিণ্ড দান করিলেন। তথা হইতে প্রয়াগ গিয়া তিনদিন সেথায় অবস্থিতি করেন। তার পর মথুরা পৌঁছিয়া ভাবোন্মত্ত হইলেন। তাহার পর শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হন।

সঙ্গিগণ সহ চিরবাঞ্ছিত শ্রীগোবিন্দ মুখারবিন্দ দর্শনে চলিলেন। তখন সন্ধ্যা আরত্রিক হইতেছে। শ্রীমন্দির সন্নিধানে যাইতেই ভাবে উন্মত্তবৎ হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, সেই গভীর হুঙ্কারে সকলেই চমকিত হইল, ও সকলেই ঠাকুরকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। শ্রীগোবিন্দ দর্শনে তিনি প্রেমোন্মাদে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, নৃত্য করিতে করিতে আবেশ হইল ও সেই অপূর্ব্ব আলাপ আরম্ভ হইল, অঙ্গে নানাবিধ সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রস্ফুটিত হইল, প্রায় চারিদণ্ড কাল ঐরূপ উন্মত্তবেশে নৃত্যালাপ করিলেন। সে স্থানে উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই এই অপূর্ব্ব ভাব দর্শনে চমকিত হইল, তাঁহার পরিচয় লইতে লাগিল। এই স্থানেই দেবেন্দ্র বাবুর সহিত পরিচয় হয়, এবং এই স্থানেই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উন্মত্তাবেশে উচ্চারিত সে ভাষা শিক্ষকপ্রসূত কি না?

বৃন্দাবনে ঠাকুর প্রায় দুই মাস বাস করেন, তথায় দ্বাদশ বন কুঞ্জ-সমূহ, এবং দ্রষ্টব্য সমুদয়ই দর্শন করেন

ঠাকুর তীর্থে আসিয়া অবধি প্রায়শঃ চারি পাঁচ আনার সন্দেশও গুরুসেবায় অর্পণ করিতেন বৃন্দাবনে কিছুদিন অবস্থিতি করিলে অর্থাভাবের কথা জানিয়া সন্দেশ স্থগিত রাখিতে প্রকাশ করিলেন তাহার পর কেশীঘাট গেলেন

কেশীঘাটে শিঙ্গাবাদক এক সাধুর সঙ্গে দেখা ও আলিঙ্গনাদি হইল ভাবে উন্মত্ত ঠাকুর আর তথা হইতে আসেন না সঙ্গিগণ তখন পরম সাবধানে তাঁহাকে তথা হইতে বাসায় লইয়া আসিলেন

বাসা সন্নিধানে আসিলে অন্য এক সাধু কতক সন্দেশ লইয়া উপ-স্থিত হইলেন, ঠাকুর সেই অপরিচিত সাধুপ্রদত্ত সন্দেশ গ্রহণে প্রথমতঃ ইচ্ছা করিলেন না কিন্তু উক্ত সাধু বিশেষ আগ্রহ করাতে পরে গ্রহণ করিলেন গুরু সেবায় পূর্ব্ববৎ সন্দেশ লাগিল এই সাধু তদবধি দুই সপ্তাহ সন্দেশ যোগাইয়াছিলেন

তাহার পর ঠাকুর হরিদ্বারে চলিলেন হরিদ্বারে বহু সাধু একত্রিত হইয়াছিলেন, ঠাকুর আনন্দে সেই সকল সাধু দর্শন করিয়া ফিরিতে লাগিলেন হরিদ্বারে ৫ ৭ দিন অবস্থানের পর বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলেন। এবার কৃষ্ণবিরহে ঠাকুর নিতান্ত কাতর হই-লেন; তাঁহার উন্মাদ ক্রিয়া সঙ্গীদিগকে এস্ত করিয়া তুলিল, তাহারা স্থান পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ বোধে শ্রীধাম ছাড়িয়া চলিলেন।

আগমন পথে অযোধ্যা ধামে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে আসিয়ে একান্ত অর্থভাব জানা গেল। দাল চাল ক্রয়েরও পয়সা নাই। এদিকে ঠাকুর সদা ভাবোন্মত্ত।

দৈবাৎ একজন অপরিচিত সাধু তাঁহাদের কাছে আসিলেন। সেই সাধু ৬৭ জনের উপযোগী দাল চাল আনিয়া ঠাকুরকে তাহা

গ্রহণ করিতে মিনতি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন তিনি অযোধ্যায় ১২ দিন ছিলেন, এই সাধু পরম আহ্লাদে ঐ ১২ দিনই তাঁহাকে দাল চাল যোগাইয়া ছিলেন

অর্থাভাব দৃষ্টে ইতিমধ্যে আলোকরাম একাকী নবদ্বীপে গমন করিয়া, নিজের রক্ষিত কতক টাকা পাথেয় জন্য পাঠাইয়া দিলেন এই টাকা লইয়া ঠাকুর নবদ্বীপে চলিয়া আসিলেন তথায় পূর্ব্বিপরে প্রায় দুই মাস অবস্থিতি করা হয় তাহার পর আখড়ায় পুনরাগমন করিলেন

মাঘমাসে তীর্থযাত্রা করিয়া ছয় মাস অন্তে আষাঢ় মাসে আখড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন

—:০:—

ভক্তে কৃপা।

স্মরণ থাকিতে পারে—যাত্রা কালে মহেশ্বরীকে একখানা আসন সেবার জন্য দিয়াছিলেন আখড়ায় আসিয়া সেই আসন তাঁহাকে প্রদান করিলেন, উক্ত আসন অদ্যাপি তদগৃহে স্থাপিত আছে

এই সময় তিনি কখন কখন উপদেশোদ্দেশে কোন কোন কথা বলিতেন তিনি সজ্ঞানে কদাপি গুরুর ন্যায় কাহাকেও উপদেশ দেন নাই; তিনি যেন সততই শিষ্য, সততই অন্যের উপদেশপ্রার্থী বলিবার নিতান্ত আবশ্যক হইলে এইভাবে বলিতেন যে 'আমাদের এইরূপ করা উচিত, এইরূপ চলা কর্ত্তব্য ইত্যাদি

তিনি কৃত্রিমতা বড়ই ঘৃণা করিতেন। ভেখ নিয়া বৈরাগ্য আচরণ না করা তাঁহার অসহ্য ছিল

"স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর "*

এই ভাবের কথা সর্ব্বদাই বলিতেন। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া অনাশক্তে গার্হস্থ ধর্ম্ম ও নিষ্কপটে কৃষ্ণ সেবা করাই তাঁহার মতে প্রশংসনীয় ছিল কিছুতেই কপটাচার তিনি দেখিতে পারিতেন না

*　　　*　　　*　　　*

ইন্দ্রমণি বাড়ী আসিয়া একান্তভাবে সাধন আরম্ভ করিলেন ও সঙ্কল্প করিলেন যে, ঠাকুরের প্রসাদই খাইবেন।

তিনি বাড়ীর উত্তরের ঘরেই থাকিতেন, নিজে যাহা খাইতেন, ঠাকুরের উদ্দেশে ভোগ দিয়া প্রসাদ করিয়া লইতেন একখানা কুশাসন ঠাকুরের উদ্দেশে পাতিয়া; তাহার সম্মুখে থালি ধরিতেন ঘরে একখানা চেয়ার ছিল, আসন খানাকে অন্য সময়ে তাহার উপর তুলিয়া রাখিতেন এইরূপ ভাবে সেবায় কিছুদিন গত হইল

একদিন ঠাকুর ইন্দ্রমণি-গৃহে গমন করিলেন কথা বার্ত্তা হইতে হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল কীর্ত্তনে ঠাকুরের আবেশ হইল, ঠাকুর আবেশে পূর্ব্বোক্ত চেয়ারস্থিত আসনে গিয়া বসিলেন। অশ্রুত ভাষায় উন্মত্তালাপ চলিতে লাগিল, সেই আলাপ মধ্যে হঠাৎ বাঙ্গাল ভাষায় বলিয়া উঠিলেন—"চলিলাম, এই আসন তো মাদের দিয়া চলিলাম।"

*　　　*　　　*

ইন্দ্রমণি আসনের সেবায় রত হইলেন, কিন্তু বেশী দিন তিনি আসনের সেবায় থাকিতে পারিলেন না ৫ ৭ দিন পরে একদা সাধিকা ইন্দ্রমণি উন্মত্তার ন্যায় আখড়ায় চলিয়া গেলেন, আর বাড়ী ফিরিলেন না ; আসন সেবার ভার মা অম্বিকার উপর পড়িল

* নারী ক্রীড়ামৃগ অসাধু এবং ভগবানের অভক্ত অসাধু উভয়ই বর্জ্জনীয় ইতি শ্রীচরিতামৃত

এই আসন সম্বন্ধে একটা রহস্য পরে ঘটিয়াছিল, এ স্থলেই তাহা বলিতেছি

সময়ান্তরে চেয়ারখানি জীর্ণ দশা প্রাপ্ত হয়, তখন অম্বিকার পুত্র শরচ্চন্দ্র উহা মেরামত করাইয়া পশ্চিমের নূতন ঘরে রাখিয়া দিলেন সেবার জন্য উহা আর মাকে দিলেন না ঐ চেয়ার সেবায় রাখা হয়, ইহা মা পুত্রকে জানাইলেন এবং পুত্রের কাছে উত্তর পাইলেন যে উহা এক্ষণে দেওয়া যাইবে না পুত্র অবশেষে বলিলেন, "তবে যদি ঠাকুর স্বয়ং এই আসনে আসিয়া উপবেশন করেন, তবে দিব" ঠাকুর তখন আখড়া হইতে কোথাও যাইতেন না, সুতরাং অম্বিকা গৃহে আসিয়া যে চেয়ারে বসিবেন তাহার সম্ভাবনা ছিল না অম্বিকা আর বাক্যান্তর করিলেন না

নবনির্ম্মিত এই "ঘর সংস্কারের" দিনে শরচ্চন্দ্র সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন, যথারীতি আখড়াতেও নিমন্ত্রণ হইল নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যথা-কালে সকলেই শরচ্চন্দ্র-গৃহে গেল, ঠাকুর গেলেন না ঠাকুর কোথাও যান না, এখানেও গেলেন না

কুলবাড় গ্রামবাসী লবচন্দ্র ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ঐ সময় আখড়ায় আসিয়াছিলেন ঠাকুর নিমন্ত্রণে যাবেন না জানা থাকিলেও শিষ্টাচার মত শরচ্চন্দ্র, সকলকে লইয়া তাঁহার গৃহে যাইতে ইঁহার কাছে বলিয়া গিয়াছিলেন

লবচন্দ্র বার বার ঠাকুরকে নিমন্ত্রণের কথা উল্লেখে, শরচ্চন্দ্র-গৃহে যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু ঠাকুর কোন উত্তর দিলেন না লবচন্দ্র দেখিলেন যে ঠাকুর ক্রন্দন করিতেছেন তখন তিনিও এক অজ্ঞাতভাবে আকুল হইয়া ঠাকুরকে কোলে করিয়া অম্বিকা-গৃহে আনিলেন ও সেই নূতন গৃহে লইয়া সেই চেয়ারেই স্থাপিত করিলেন। ঠাকুর তখনও ক্রন্দন করিতেছেন

অসম্ভব সম্ভব হইল, অম্বিক ও শরচ্চন্দ্রের ভক্তিবলে অসম্ভব সম্ভব হইল, যিনি আসিবার নহে তিনি আসিলেন ও সেই চেয়ারে বসিলেন সেই যে আসন দান করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন—"চলিলাম।" ইহার পর এইই অম্বিকা গৃহে ধাওয় হইল শরচ্চন্দ্রের সঙ্কল্পগত কার্য্য হইল সেই চেয়ারখানা তদবধিই সেবিত হইতেছে, অম্বিকার লোকান্তরের পর হইতে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র কর ইহার নিয়মিত সেবা করিতেছেন

* * *

বলিয়াছি—ঠাকুর সতত শিষ্য। তিনি কাহাকেও কদাপি শিষ্য জ্ঞান করেন নাই, মন্ত্র দেন নাই। তবে যাঁহারা তাঁহার শিষ্যাভিমান করেন, কেহ বা সঙ্কীর্ত্তনে, কেহ ব আবেশাবস্থায় নাম পাইতেন, তাঁহারাই তাঁহাকে গুরুরূপে গণ্য করিয়াছেন

ইটাস্থ রাজনগর বাসী সুধারাম মাহারা নামক একব্যক্তি একদা আখড়ায় আগমন করে তখন কীর্ত্তনে ঠাকুর বিভোর আছেন সুধারাম ঠাকুরকে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ যেন এক আকর্ষণে গিয়া ঠাকুরের চরণে পড়িল, কে যেন রজ্জু দিয়া টানিয়া লইয় ফেলিল সুধারামের চেতনা নাই, ঠাকুরও আবেশচিত্ত ঠাকুর সেই আবেশ ভরেই তাহার কর্ণে নাম দিলেন। সুধারাম কাটা কবুতরের ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ঠাকুর আবেশিত চিত্তে এইরূপই কখন কখন নাম দিতেন

পরবর্ত্তী হইলেও এই স্থলেই আরও দুজন ভক্তের কথা বলিতেছি বাঘের প্রসিদ্ধ চৌধুরী বংশীয় গৌরচন্দ্র চৌধুরী মৌলবী বাজারে পেশকারী করিতেন, তিনি তত্রত্য কালেক্টরীর হেডক্লার্ক সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী সহ একদা ঠাকুরদর্শনে আখড়ায় আসিলেন

ঠাকুর তখন মশারি খাটাইয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন, কেহ সহজে

তাঁহাকে দেখিতে পাইত ন ইঁহারা আসিয নিকটেই দুইটি ছাদার উপরে বসিলেন তাঁহার কাহাকেও কিছু বলিলেন না, বসিয আপন মনে নাম জপ করিতে লাগিলেন

বহুক্ষণ তাঁহারা বসিয় রহিলেন তাঁহাদের নীরব আহ্বানে ঠাকুর বিচলিত হইলেন, মশারির বেষ্টন দূর হইল, ঠাকুর বাহির হইযা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন দিলেন ইঁহারা উভযেই তদবধি বাধ পড়িলেন এই সময় হইতে আখড়ায প্রতি রবিবারে কীর্ত্তন হওযার রীতি হয ইঁহারা প্রায়শঃ রবিবারে আসিয়া কীর্ত্তন করিতেন পেশকার মহাশযের প্রভূত শক্তি জন্মিযাছিল শক্তিমন্ত্র উপাসক সচ্চিদানন্দ এ যাবৎ জীবিত আছেন

ইন্দ্রমণির মাসী কন্যা মান্দারকান্দির বৃন্দাবাসী একদা মাসীর গৃহে আসিলে, মাসী ইহাকে লইযা সাধু সদনে গমন করেন ঠাকুর ইহাকে দেখিযাই ক্রুদ্ধ হইলেন মাসী অম্বিক বৃন্দার প্রতি কৃপার জন্য ঠাকুরকে সাধিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই ঠাকুরের চিত্ত প্রসন্ন হইল না।

তখন বৃন্দাকে লইয অম্বিক ফিরিযা আসিলেন এবং উপদেশ দিলেন, "তুই আখড়ায অঙ্গনাদি পরিষ্ক র করিবি, ইহাতে তোর প্রতি যদি বা ঠাকুর প্রসন্ন হন " বৃন্দা তাই করিতে লাগিলেন, এইরূপে কয়েকদিন অতীত হইল আখড়ায় ক্রমশঃ যাতাযাত করাতে বৃন্দার মন কতকট সবল হইল।

একদিন সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে বৃন্দার আপন মনে নিজের দুষ্কৃতি স্মরণ হইল ঠাকুর সকলকে সদয ব্যবহার করিলেও তাহার প্রতি তিনি বিরূপ কেন বিরূপ, বৃন্দ আপন মনে বুঝিলেন, এবং উজ্জ্বলা নাম্নী এক বৈষ্ণবীর কাছে আপন পূর্ব্বকৃত পাপ কীর্ত্তন করিযা অনুতাপ করিতে লাগিলেন

এদিকে কীর্ত্তনে ঠাকুরের আবেশ হইযাছে, তিনি কীর্ত্তন হইতে চলিযা আসিয়া বৃন্দাকে তখনই এক লাথি মারিলেন বৃন্দা আশান্বিতা হইলেন

আর একদিন কীর্ত্তনে তদ্রূপই আবেশ হইল, আবেশে বৃন্দাকে ডাকিলেন, উপদেশ দিলেন, "তুই আজ হইতে আঠার মাস হবিষ্যান্ন করিবি"

বৃন্দা গৃহে গিয়া ঠাকুরের উদ্দেশে এক আসন স্থাপন করিলেন ও আঠার মাস হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিযা সেই আসনে ভোগ দিযা একবেলা আহার করিতেন তৎপরে আঠার মাস অন্তে স্বপ্নাবেশে বৃন্দা নামোপদেশ পাইয়াছিলেন বৃন্দা অদ্যাপি জীবিতা আছেন ও সেই আসনের সেবা করিতেছেন বৃন্দার পরে তদীয় দেবর গুরুপ্রসাদের পুত্রই এই আসনের সেবার ভার পাইবার সম্ভাবনা

—:০:—

প্রত্যক্ষ গুরুভক্তি।

এক্ষণে আখড়ার নাম চতুর্দ্দিকে ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইতেছে আখড়ার প্রতিবাদী কেহই নাই, আখড়ায় নিত্যই উৎসব কিন্তু এই উৎসবের বন্যায় হঠাৎ ভাটা পড়িল, পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই এক ভাবে থাকে না সেই অর্দ্ধোদয়ের চতুর্থ কি পঞ্চম বর্ষে মনোমোহিনীর জ্বর হইল, চার পাঁচ দিনের জ্বরেই বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল, আখড়ায় আসিবার আর শক্তি নাই এ অবস্থায় সাধু তাঁহাকে আখড়াতেই আনাইলেন

সেই যে কথা—আখড়ায় আসিযা থাইবেন, সেই কথার এই সময়েও ব্যত্যয় ঘটিল না। উত্থানশক্তিরহিতা হইলেও, তাঁহাকে আখড়াতেই

আসিয়া আহার করিতে হইত। সকলেই বুঝিল, এবার আর মনোমোহিনীর দেহ থাকিবে না। মনোমোহিনীর পূর্ব্বাবধিই ভেখ গ্রহণের ইচ্ছা ছিল, এইবার নিজ ইচ্ছা পূরাইলেন। শিষ্যকে বলিয়া একজন ভেখাশ্রিত বৈষ্ণব আনাইয়া তাহা হইতে ভেখ লইলেন। ভেখ গ্রহণের নয় দিন পরে, আশ্বিনের লক্ষ্মী পূর্ণিমা তিথিতে ব্রাহ্ম মুহূর্তে মনোমোহিনী এ মায়ারাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মনোমোহিনী গেলেন, ঠাকুরের কিন্তু কোনরূপ ভাববিকার ঘটিল না ; তিনি যে বিষাদিত হইয়াছেন বাহ্যে তাহা বুঝা গেল না। তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না ; শুধু পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। তখন উপস্থিত আর আর সকলে বৈরাগী আনাইয়া ভেখাশ্রিতা মনোমোহিনীর দেহ লইয়া আখড়ার উপরে সমাধি দিলেন। তিনি উচ্চবাক্য কিছুই বলিলেন না।

এদিকে মধ্যাহ্নে সেবার সময় উপস্থিত হইল। ঠাকুরের অভিপ্রায় মত ইন্দ্রমণি সেবার জন্য অন্ন পাক করিলেন। মনোমোহিনী যথায় প্রত্যহ আহার করিতেন, ঠাকুর তথায় প্রস্তুত অন্নথালি লইয়া রক্ষা করিলেন। থালি সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল। গুরুর প্রসাদ নহিলে সে অন্ন কেমনে গৃহীত হইবে ? মনোমোহিনী খাইলেন না, সে অন্ন আর আন হইল না। ঠাকুর উপবাসী রহিলেন।

ইন্দ্রমণি ঠাকুরের শিষ্যা। আখড়াতে বাস করেন ও গুরুর প্রসাদ ব্যতীত কিছু গ্রহণ করেন না। কাজেই তিনিও উপবাসী রহিলেন।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন,—ঠাকুর অন্নগ্রহণ করেন না। নানা জনে নানারূপ প্রবোধ দিতে চাহিল। কিছুতেই সেই অটল পুরুষের সঙ্কল্প ভাঙ্গিল না, তিনি গুরুর প্রসাদ ব্যতীত খাইবেন না। ইন্দ্রমণিকেও কাজে কাজেই উপবাসিনী থাকিতে হইল।

এই রূপে একাদশ দিবস অতীত হইল, দ্বাদশ দিবসে অনেক লোক আখড়ায় আসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বাবদিনের অনাহারী ঠাকুরের সে কীর্ত্তনে আবেশ হইল দেহে যেন কিছুমাত্র গ্লানি নাই, কীর্ত্তনে তিনি ভাব বেশে পূর্ব্বানুরূপ নৃত্য করিলেন।

এ সব সিদ্ধ মহাত্মা যেন এক ভাবের তরঙ্গোপরি সদা অবস্থিতি করিতেছেন বাহ্য ব্যবহারে তাঁহাদের সে ভাব তরঙ্গ ছুটাইতে পারে না তরঙ্গের উপরে বাহ্য ব্যবহারের যে কিঞ্চিৎ ছায়াপাত দৃষ্ট হয়, তাহা সামান্য চেষ্টাতেই দূরীভূত হইয়া থাকে, তখন তাঁহারা জলের মীনের মত জল তল-গত হন, অর্থাৎ ভাবতরঙ্গে ডুবিয়া যান ও আনন্দ অনুভব করেন

কীর্ত্তনে জলের মীন জল পাইল, ঠাকুর নাচিতে লাগিলেন, বাহ্য অনাহার তাঁহার কি করিবে?

কিন্তু ইন্দ্রমণি কি রূপে এ দীর্ঘ উপবাস সহ্য করিলেন? পাঠক ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন

ভারি বস্তু জলে ভাসে না—ডুবে কোন পদার্থ কষ্টে শ্রেষ্টে ভাসিতে পারে, কোন পদার্থ সহজেই ভাসিয়া থাকে এবং অনুসঙ্গে অপর বস্তুও ভাসাইতে পারে, হাল্‌ক কাষ্ঠ স্বয়ং ভাসে, জল-তল-গামী লৌহও তাহার সহিত ভাসিয়া থাকে তরণী নিজে ভাসে, অনুসঙ্গে আরও কত বস্তু বক্ষে লইয়া চলে, তরণীযোগে নরনারী নদী উত্তরণ করে

এ সংসারে সাধু ব্যক্তিগণও তরণীস্বরূপ পাপভারাক্রান্ত আমরা তাঁহাদের কৃপাশ্রয়ে ভবনদী অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারি সাধু কৃপা ব্যতীত পাপীর নিম্ন গতি কেহ রোধ করিতে পারে না।

ইন্দ্রমণি সাধিকা ও ভক্তিমতী, তাহাতে সিদ্ধ মহাত্মার কৃপাপ্রাপ্ত তিনি গুরুপদে একান্ত শ্রদ্ধান্বিতা, তাঁহার একনিষ্ঠা এবং

নিয়মনিষ্ঠাই তাঁহাকে দীর্ঘ উপবাস সহ্য করিবার শক্তি দিল, ইহা ব্যতীত আর কি বলিব? তাঁহার এ অদ্ভুত সহিষ্ণুতা তদীয় গুরুপদে বিশ্বাস ও ভক্তি এবং গুরুর উপর নির্ভরশীলতারই একতম পুণ্যপ্রদ ফল তার পরে যিনি উপাস্য যাঁহাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, সে মরণ বাঁচন পণ করিয়া উপবাসী, আমি পেট ভরিয়া আহার করিতে পারি কি? কদাপি না। এ নিঃস্বার্থ নির্দ্দোষ প্রীতি যদি প্রেমময়ের প্রেমপ্রসূত হয়, তবে প্রেমময়ই এরূপ পরীক্ষায় শক্তি দানে রক্ষা করিবেন

ইন্দ্রমণির শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা কিরূপ ঘটিয়াছিল, ইহাও পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এ স্থলে ইহারও সদুত্তর দেওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তিনি যখন এযাবৎ জীবিতা আছেন, তখন তৎসম্বন্ধে এতাধিক আলোচনা সঙ্গত নহে।

দ্বাদশ দিনের পর আরও ছয়দিন দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল, একজনও জলগ্রহণ করিলেন না। ঊনবিংশতি দিবসে এক নূতন বিষয় উপস্থিত হইল

অম্বিকার প্রাণকৃষ্ণ, শরচ্চন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র, এই তিন পুত্র এবং ইন্দ্রমণি ও কুঞ্জমণি নামে দুই কন্যা। কুঞ্জমণির বিবাহ মান্দার কান্দিতে হইয়াছিল। কুঞ্জমণির সন্তানাদি না হওয়াতে তাহার স্বামী প্রভৃতি মানস করেন যে ইহার একটি সন্তান হইলে, আখড়াতে গিয়া সেব দিবেন ও প্রসাদ দ্বারাই তথায় সে সন্তানের অন্নপ্রাশন করিবেন।

পরে কুঞ্জমণির নিরুদ্বেগে একটি কন্যা জাত হয়, আজ তাহার দ্রব্যাদি সহ সেই মানস আদায় করিতে সপরিবারে আখড়াতে উপস্থিত

কিন্তু এ কি বিভ্রাট! কোথায় সংকীর্ত্তনামোদে তাঁহারা কন্যার অন্নাশন করিবেন, আর কোথায় এ নিরানন্দ ক্রন্দনের করুণ

কোলাহল কুঞ্জমণিরা ঠাকুরের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন কিন্তু ঠাকুর কিছুতেই অন্ন গ্রহণ করিবেন না কুঞ্জমণিরা রোজ ঠাকুরকে সাধেন, কিন্তু সফলতার আশ্বাসও পান না দ্বাবিংশতি দিবসে কুঞ্জমণিরা এইরূপ ঠাকুরের পদে ক্রন্দন করিতেছেন, হঠাৎ আবেশ হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন—"সেবা হবে" "সেবা হবে"

"সেবা হবে" "সেবা হবে" শুনিয়া কুঞ্জমণিরা আনন্দিত হইলেন "সেবা হবে" ইন্দ্রমণি প্রভৃতিও শুনিলেন "সেবা হবে" শব্দ গ্রামে প্রচারিত হইল "সেবা হবে" জানিয়া সকলেই ভাবিল 'যা'ক এইবার ইঁহারা বাঁচিলেন "সেবা হবে" শুনিয়া আনন্দে সব লোক নানা উপহার আনিয়া উপস্থিত করিল

সেদিন জলপানি ভোগ দেওয়া হইল, মনোমোহিনী তৈজস মূর্ত্তিতে শিষ্যের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিলেন ঠাকুরের মন সেদিন প্রসন্ন হইল এবং তিনি প্রসাদ গ্রহণ করিলেন গুরুসেবা অন্তে ইন্দ্রমণি জলপানি প্রসাদ খাইলেন।

পরদিন অন্নভোগ হইবে ইন্দ্রমণি দ্বাবিংশতি উপবাসে ক্লিষ্টা,—কঙ্কালাবশিষ্টা; তপস্বিনী ইন্দ্রমণি সকালে স্নান করিয়া পাকান্তে অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিলেন অন্ন নিবেদন হইল, সাধনায় সিদ্ধি হইয়াছে, গুরু আর শিষ্যদত্ত অন্ন অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না এয়োবিংশতি দিবসে সকলেই স্নানাহার করিলেন।

তাহার পরে কুঞ্জমণির কন্যার যথামতি অন্নশন হইল, তাঁহারাও বিদায় হইয়া চলিয়া গেলেন

মনোমোহিনীর দেহত্যাগের পর হইতে ঠাকুরের রীতি আর একরূপ হইল তখন হইতে তিনি লোক সমাজে বাহির হইতেন না; মশারি খাটাইয়া একাকী নামাবেশে বসিয়া রহিতেন ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে পেশকার প্রভৃতি ঠাকুরকে মশারি আচ্ছাদনে বসিয়া

থাকিতে দেখিয়াছিলেন, সে ভক্তসম্মিলন এই সময়ের পরের ঘটনা। এই সময় হইতে ঠাকুর আখড়া ত্যাগ করিয়া আর কোনও স্থানে যাইতেন না। ইতিপূর্ব্বে লবচন্দ্র ঠাকুরকে কোলে করিয়া অম্বিকা-গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক চেয়ারে স্থাপন করার যে সংবাদ বলা গিয়াছে, তাহা এই সময়ের পরেই ঘটিয়াছিল।

——:০:——

পুষ্প-মালা।

"ভারত নাই" "ভারত নাই"– একদিন ঠাকুর আবেশাবস্থায় বলিতে লাগিলেন—"ভারত নাই" ঠাকুরের স্বর ক্রমে ক্রন্দনময় হইল, ক্রন্দনস্বরে বলিলেন—"ভারত নাই"

কোন্ ভারত নাই? কাহার কথা হইতেছে? ভক্তগণ প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না শেষে কথাটা বুঝা গেল

গোপালকৃষ্ণ দত্তের দুই ভাই ভারতচন্দ্র ও জগচ্চন্দ্র বালাগঞ্জে থাকিতেন তন্মধ্যে জগচ্চন্দ্র তখন বাড়ীতে, তিনি জ্বরে অত্যন্ত কাতর ভারতচন্দ্রেরও তখন জ্বর, কিন্তু তিনি কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিলেন ও বাড়ী আসিলেন।

জগচ্চন্দ্রের অবস্থা বড়ই খারাপ, তদ্দৃষ্টে ভারত আখড়ায় গিয়া ঠাকুরকে ভ্রাতার রোগের কথা বার বার বলিতে লাগিলেন।

সহসা ঠাকুর আবিষ্ট হইলেন ও ভারতচন্দ্রকে উত্তরে বলিলেন "জগচ্চন্দ্রের পীড়া বলিতেছ, সেতো ভাল; তুমিই তো কালরোগগ্রস্ত দেখিতেছি"

জগচ্চন্দ্র অচিরেই আরোগ্য হইলেন কিন্তু ভরত পুনঃ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং অচিরেই তাঁহার চলচ্ছক্তি রহিত হইল

জগচ্চন্দ্র ঠাকুরের বাক্য পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন এখন, ভরতের এই অবস্থা দৃষ্টে ভীতচিত্তে একছড়া কলা লইয়া আখড়ায় গেলেন

কলা দেখিয়াই ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন "নিয়ে যাও" "নিয়ে যাও "

জগচ্চন্দ্রের মনের অবস্থা তখন ভাবুন ভ্রাতা মরণাপন্ন — সাধুর কৃপায় মঙ্গল হইবে মনে করিয়া কলা লইয়া গিয়াছেন। কলা সেবার জন্য রাখা হইলে, ভাইয়ের ভাবি মঙ্গল, ইহাই ধারণা সেই স্থলে কলা দেখিয়াই ঠাকুর বলিতেছেন—"নিয়ে যাও", "নিয়ে যাও "

এমন হইলে ভ্রাতৃস্নেহ কাতর হৃদয় কিরূপ পীড়িত ও সন্ত্রাসিত হইতে পারে, মনে ভাবুন জগচ্চন্দ্র ত্রাসিতচিত্তে একান্তমনে এই উপহার গ্রহণ করিতে ঠাকুরকে মিনতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই এক "নিয়ে যাও" "নিয়ে যাও" রবের ব্যতিক্রম ঘটিল না

তখন জগচ্চন্দ্র অগত্যা বলিলেন "ঠাকুর, কলা রাখুন সেবার জন্য রাখুন ভ্রাতার মঙ্গলের জন্য দিতেছি না; সেবার জন্যই দিতেছি।" এইরূপ বলিলে অগত্যা ঠাকুর তাহা রাখিলেন।

এদিকে ভরতের জ্বরে অঙ্গ-ক্ষত হইয়া গলিতে লাগিল ও তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল "ভরত নাই" বলিয়া ঠাকুরের খেদোক্তির মর্ম্ম তখন সকলে প্রত্যক্ষ করিল

ঠাকুর মশারি বেষ্টনে থাকিতেন, পাঠক জানেন, বলা আবশ্যক যে এই সময়ের পূর্ব্ব হইতেই তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন

* * *

আগরা নিবাসিনী চৌধুরাণী পদবিযুক্তা জনৈকা ব্রাহ্মণী একদা স্বপ্নযোগে জানিলেন যে "ঠাকুর"ই তাহার গুরু। এই স্বপ্ন দর্শনের পর তিনি বিবিধ উপহার সহ আখড়ায় উপনীত হইলেন, ও ঠাকুরকে

যথোচিত শ্রদ্ধা সহকারে স্বপ্ন বিবরণ বলিলেন শুনিয়া ঠাকুর হাসিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, স্বপ্নের কথার নিশ্চয়তা নাই,' স্বপ্ন অনুসারে কে চলে ? বিশেষতঃ শূদ্রকে ব্রাহ্মণের সম্মানাদি করা অবিধি। কিন্তু ব্রাহ্মণী প্রবোধ না মানিয়া উন্মত্তার ন্যায় তাঁহার চরণে প্রণতা হইলেন। যাহারা উপস্থিত ছিল, এই ব্যাপার দৃষ্টে চমকিত হইল তিনি ব্রাহ্মণীকে বুঝাইলেন,—বাহ্যাচারে কদাপি বিধি-ব্যতিক্রম কর সঙ্গত নহে, ইহাতে ধর্ম্ম হানি হয়

ব্রাহ্মণীকে প্রবোধ দিয়া তাঁহার আনীত দ্রব্যাদি ফিরাইয়া লইতে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণী তৎসমস্ত আখড়াতে ফেলিয়াই চলিয়া গেলেন

ব্রাহ্মণী তাহার পর প্রায় দুই বৎসর জীবিতা ছিলেন; দুই বৎসর তিনি উভয়ত্র যাতায়াত করিয়া ক্ষেপণ করিয়াছিলেন

* * * *

মজিদপুর গ্রামে রাসবিহারী হালদারের বাস হালদার বাহ্যকৃত্য করিয়া একদা গৃহে আসিতেছেন এমন সময় এক অপরিচিত পাগল-প্রায় ব্যক্তি গিয়া তাঁহাকে ধরিল হালদার বুদ্ধিমান ও ভদ্রলোক, তিনি সে অপরিচিত ব্যক্তির লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার সঙ্গে চলিলেন। প্রায় এক মাইল দূরে—আখড়াতে তিনি তৎসহ উপস্থিত হইলেন দেখিলেন—অপূর্ব্ব কীর্ত্তন হইতেছে।

হালদার তফাৎ দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন দেখিতেছেন, ক্রমে কীর্ত্তনের শক্তিতেই যেন আকৃষ্ট হইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন তখন ঠাকুর তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন, হালদার আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। হালদার তদবধি এক প্রধান ভক্তরূপে গণ্য হইলেন হালদার মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিশারদ ছিলেন

এক্ষণে হালদারের আনয়ন সংবাদটী বলিব এক বৎসর পৌষ

াসে ঠাকুব বিবিধ আড়ম্বরে এক সংকীর্ত্তনেব যোগাড় করিয়াছিলেন
তুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জনগণকে কীর্ত্তনেব নিরূপিত তারিখ জনাইয়া দেওয়া
য় চতুর্দ্দিকে জনবব হইয়াছিল যে, আখড়ায "অমুক দিনে একটা
কীর্ত্তন হইবে " সংবাদ শুনিয়া বহু লোক একত্রিত হইয়াছিল
আখড়ায দূরাগত আগন্তুকগণের জন্য প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও
হইয়াছিল

বহুলোক সংঘট্টে দলে দলে কীর্ত্তন হয, কীর্ত্তনে অনেক ঐশ্বর্য্যও
প্রকটিত হইয়াছিল ; ঠাকুর নৃত্যাবেশে কখন এখানে কখন ওখানে
বিচরণ করিয়াছিলেন, অনেকেই নিজ নিজ দলে ঠাকুরকে পাইয়া তৃপ্ত
হইয়াছিল ঠাকুরকে কখন বা কোন ভক্ত স্কন্ধে তুলিয়া নাচিতেছে,
কখন বা ঠাকুব জনসঙ্ঘেব উপরে আবেশে শযন কবিয়াছেন, ইত্যাদি
বিবিধ বিচিত্র চিত্রে প্রায় দিবারাত্র কাটিয়া গিয়াছিল, শেষ রাত্রে প্রসাদ
খাওয়ান হয প্রসাদ ভক্ষণের পব গ্রামবাসীরা স্ব স্ব আবাসে চলিয়া
গেল, দূরাগত জন আখড়াতেই রহিল

ইহারা দূর হইতে আসিযাছে। একদিনে তাহাদেব সাধ মিটিবে
কেন ? প্রভাতে পুনঃ কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, ঐ রাত্রেও সেই রূপই
কীর্ত্তনান্তে প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ বিশ্রাম কবিল প্রায় ৫ ৬ শত
লোক এইরূপই কীর্ত্তনানন্দে বিভোর

তৃতীয দিনেও কীর্ত্তন হইতেছে, ঠাকুর কীর্ত্তন রসে বিহ্বল সেই
সময গোবিনাথপুরবাসী প্রাণকৃষ্ণ দেব নামক জনৈক ভক্ত—যিনি
হালদারকে অথবা তাঁহার বাড়ী কোথায়, জানিতেন না, সহসা উন্মাত্তের
ন্যায তিনি কীর্ত্তন মণ্ডলী ছাড়িয বাহির হইলেন ও উন্মত্তের ন্যায়ই
পূর্ব্বাভিমুখে দৌড়িলেন। প্রাণকৃষ্ণ এইরূপে দৌড়িয়া যাহা কবিয়া-
ছিলেন, হালদাব মহাশয কীর্ত্তনে উপস্থিত হইলে তাহা প্রকাশ পাইল

——:০:——

তিরোধান।

আলোক তৃপ্ত মৎস্য, জ্যোৎস্নাপ্রভা পুলকিত-চিত্তে উৎফুল্লভাবে উল্লম্ফন করে ; হায়, মৎস্য মনে করে না —আলোর পাছে অন্ধকার, ভাবে না পূর্ণিমার প্রতিদ্বন্দ্বী অমানিশা আছে

কীর্ত্তনের প্রথমাবস্থায় অধিকাংশই নাম কীর্ত্তন হইত, লীলা-কীর্ত্তন প্রায় থাকিত না মধ্যাবস্থায় লীলা কীর্ত্তন হইলেও সে সব গৌরগীতি। কৃষ্ণ সঙ্গীত অতি অল্পই হইত কীর্ত্তনামোদী হালদার আসার পর কৃষ্ণকীর্ত্তন বই আর হইত না ঠাকুরের প্রত্যেক বিষয়ই ক্রমানুসারিণী, ইহা কেহ স্বেচ্ছাতঃ নিয়মিত করে নাই, দৈবই এরূপ করিয়াছেন।

হালদারের অপূর্ব্ব কীর্ত্তন আরম্ভ হইলেই ঠাকুরের ভাব হইত, আবেশে তিনি নানা ভাবে নৃত্য করিতেন এই আবেশের সময় হালদার প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তগণ ভাবানুসারে তাঁহাকে সাজাইতেন। কখন বা নূপুর পায়ে দিতেন, জ্ঞানশূন্য ঠাকুর তখন অপূর্ব্ব ভঙ্গীমায় নাচিতেন কখন কখন তাঁহারা ঠাকুরকে চূড়া বাঁশী দিতেন ; ঠাকুরকে যেন ব্রজের রাখাল বলিয়াই বোধ হইত

একদিন এইরূপ কীর্ত্তন হইতেছে, প্রায় দুইপ্রহর যাবৎ কীর্ত্তন কিন্তু ভাবের নেশা ছুটিতেছে না —কীর্ত্তন ভাঙ্গিতেছে না শেষে অকাল জানিতে পারিয়া স্থির হইলেন ও ভক্তগণ সহ স্নানে গেলেন।

জলে নামিয়াই আবার ভাবোদয় হইল, তখন ভক্তগণ সহ কতক্ষণ সন্তরণ করিলেন পরে আপনা আপনি ঘাটের উপর

উঠিয়া বসিলেন তখনও বিভোর রহিয়াছেন, ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া আখড়ায় আনিলেন। আখড়ায় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সেইরূপ বিহ্বলাবস্থায়ই পূর্ব্বমুখী দৌড়িলেন কেন দৌড়িলেন, কে জানে? অনেকেই তখন ফিরাইতে পাছু ধাইলেন, কিন্তু প্রেমোন্মত্তের লাগাল পাইবে কে? সকলেই ফিরিয়া আসিল

শরচ্চন্দ্র বহুদূর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িলেন; অবশেষে তিনিও পরাস্ত শরচ্চন্দ্র ভাবিলেন—"প্রেমোন্মত্ত স্বয়ং ধরা না দিলে সাধ্য কি ধরিব?" যেমন এ ভাব মনে হইল, অমনি ঠাকুর ধরা দিলেন

তখন তাঁহার স্তম্ভভাব, যেন—"বিশ্বম্ভর" উঠায় কাহার সাধ্য? তৎক্ষণে আলোকচন্দ্র তথায় গেলেন ও মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাঁহাকে উত্তোলন অসাধ্য বোধ হইয়াছিল, তাঁহাকে অনায়াসে লইয়া আসিলেন

এই সময় হইতে এইরূপ সর্ব্বদাই ভাবাবিষ্ট থাকিতেন যাঁহারা শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন, এই সময় তাঁহারা ভক্তিশাস্ত্রানুযায়ী ঠাকুরের ভাবস্ফুরণ অনুভব করিতেন

এই সময় একদিন প্রদোষে নাম কীর্ত্তন হইতেছে; কীর্ত্তনে ঠাকুরের আবেশ হইয়াছে, তিনি তৎকালে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"অক্রূর আসিবে নিতে, যাইব চলিয়া"

মনোমোহিনী আখড়ায় আসিয়া যে তক্তপোষে বসিতেন, ঠাকুর সেই "আসনে" গিয়া বসিলেন এবং পুনঃ গম্ভীরভাবে বলিলেন:—

"বর লও বর লও, দিব তোমা সবে"

অক্রূরের ক্রূর সংবাদ শ্রবণে ভক্তগণ তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভয়, উৎকণ্ঠা ও শোকাবেগের যুগপৎ কশাঘাতে তাহাদের বুদ্ধি স্তম্ভিত, সকলেই যেন আত্মবিস্মৃত—কেহই কোন বর চাহিলেন না

সেই হইতে সাধুর ভাব ও প্রেম উন্মত্তরূপ ধারণ করিল, সেই হইতে সকলেই বুঝিল যে, কি জানি কোন দিন কি করিয়া বসেন হায়, হায়, তবে কি এ সুখের হাট ভাঙ্গিয়া যাইবে ?

চলুক চলুক চলুক কীর্ত্তন
নাচুক ভকতগণ
ভেঙ্গনা ভেঙ্গনা সুখের এ হাট
বিলাও সে প্রেমধন
ওই দেখ ওই তৃষিত হইয়ে
কাতর কাঙ্গাল জন,
কিরূপে ত্যজিবে ? দয়াতে গঠিত
জানি তো তোমার মন
তাই বলি শুন, চলুক কীর্ত্তন
নাচুক ভকতগণ
ভেঙ্গনা ভেঙ্গন সুখের এ হাট
বিলাও সে প্রেমধন

হাট ভাঙ্গিল না, ঠাকুর হাট রাখিয়া দিলেন

* * * *

আখড়ায় অনেকেই দ্রব্যাদি আনিয়া দিত বলিয়াছি অনেকেই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মানতও রাখিত এবং যথাকালে আখড়ায় তাহা আনিয়া দিত, ইহারও উদাহরণ পাঠক দেখিয়াছেন। অনেক সময় আগন্তুক ও ভক্তগণ স্বেচ্ছাতঃ অর্থবিত্তও আনিয়া দিত দাতার ভক্তি ও অত্যাগ্রহে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না এইরূপে এক সময় দেখা গেল যে দ্বিশতমুদ্রা জমা হইয়া গিয়াছে।

অর্থ অনর্থের মূল অর্থ থাকিলেই অনর্থ ঘটে এখন এ অর্থ কি করা যাইবে ?

গৃহস্থের অভাব অপ্রতুল সর্ব্বদাই থাকে আখড়ায় অর্থ আছে, অভাবে ধার পাওয়ার জন্য প্রতিবাসিগণ যাতায়াত করিবে, অসম্ভব নহে। চাহিলে দিতেই হইবে দিলে অনেক সময় আদায় করা কঠিন হয় কিন্তু ভক্ত দত্ত—দশজনের দেওয়া অর্থের এরূপ অপব্যয় কে করিবে? যে করিবে সেই প্রত্যবায়ী হইবে এমতাবস্থায় এই অর্থ ব্যয় করাই সঙ্গত

গুরুকৃপায় আবশ্যক ব্যয় তো চলিতেছে? যথালব্ধ দ্রব্যে তুষ্ট থাকাই বৈষ্ণবাচার এতদিনের সাধন ভোগের জন্য নহে অতএব এ দ্বিশত মুদ্রা ব্যয় করা চাই

ব্যয়ের পন্থা কি? মহোৎসব?—তাহাতো নিত্যই চলিতেছে — তৈজস পত্র?—কোন প্রয়োজন নাই স্থির হইল, মাটির ধন মাটিতেই ফেলা হইবে, এতদ্দ্বারা ইষ্টক প্রস্তুত হইবে, কেহ নিবে না, ছুবে না; এবং যদি প্রয়োজন পড়ে, তবে আখড়ারই কোন কাজে লাগিতে পারিবে।

তাই হইল, দ্বিশত মুদ্রার ইষ্টক প্রস্তুত হইল কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এতৎ মধ্যে আপনা আপনি আরও টাকা জমিতে লাগিল; তাহাও ইষ্টক প্রস্তুতে গেল।

অনেকটা ইষ্টক হইয়া গেলে, তখন আরও কিঞ্চিৎ জমা টাকা ব্যয়েরও পথ সম্মুখেই দেখা গেল তখন উত্তরের গৃহ যেস্থানে, তথায় একখানা ক্ষুদ্রতম ইষ্টক গৃহ উত্থিত হইল দালানে দুইটি প্রকোষ্ঠ থাকিবার ব্যবস্থা হইল, পূর্ব্বের প্রকোষ্ঠের পূর্ব্বাংশে ভিত্তির ভিতর একটা চতুষ্কোণ গর্ত্ত, ঠাকুর স্বয়ং খনন করাইয়া বাঁধাইয়া লইলেন এই গুহাতলে একজন লোক স্বচ্ছন্দে শয়নোপবেশন করিতে পারে। কি অভিপ্রায়ে এ গর্ত্তটি করা হইল, কেহই বুঝিতে পারিল না

এদিকে ঠাকুরের ভাব ও ব্যবহার ক্রমশঃই অন্তর্ম্মুখীন হইতে চলিল। কীর্ত্তন অহরহঃ হয়, আবেশ ও বিহ্বলতাও অহরহঃ; তাহা যেন আর ছুটিতে চাহে না ভক্তগণ সদাই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকেন এ সঙ্গ এক তিলও ছাড়িতে প্রাণ চাহে না

সময় সময় তখন বলিতেন—"এরূপে আর চলিতেছে না, নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতে পারিলেই ভাল ঐ যে গুহা, এরূপ স্থানে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিতেই মনে হয়" কখন কখন বা বলিতেন—"মাটি চাপা দিয়া সমাধি দেওয়া বড়ই অসঙ্গত প্রশস্ত-গর্ত্ত সমাধি গহ্বরে ছিদ্র রাখিয়া সমাধি দেওয়াই ভাল —কি জানি যদি বা প্রাণ থাকে বায়ু চলিবার বিধান রাখিয়াই সমাধি দেওয়া সঙ্গত।"

এসকল কথা মর্ম্মীদের কাছে, যেন গল্প প্রসঙ্গেই বলিতেন

হায় এরূপ গল্প, এরূপ ইষ্টগোষ্ঠির সৌভাগ্য ভক্তদের ক্রমেই তিরোহিত হইতে লাগিল হঠাৎ ঠাকুরের দেহে ব্যাধি দেখা গেল ব্যাধির নির্দ্ধারণ নাই, আজ মাথার ব্যাথা, কাল কফের প্রকোপ, পরশ্ব কিছু নাই ভাল, তৎপরদিন বায়ু বা পিত্ত রাগিয়া উঠিল

একদিন শ্বাস বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা গেল, পরে পুনঃ উপশমিত হইল আর একদিন সমস্ত দেহ যেন সঙ্কোচিত হইয়া ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইল, পুনঃ আপনা আপনি সাম্যতা লাভ করিল। ভক্তগণ চিন্তিত হইলেন, ভীত হইলেন। তাঁহারা কবিরাজ দ্বারা চাওয়াইলেন, ডাক্তার আনিয়া দেখাইলেন কিন্তু ঔষধে কোন ক্রিয়াই করিল না ভক্তবর্গের দুঃখ হইবে ভাবিয়া তিনি ঔষধ দিতে নিষেধ করিতেন না।

রোগের বৃদ্ধিই হইতে লাগিল কিন্তু ইহা কি রোগ,—কে জানে? সমস্ত দেহ সঙ্কোচিত, হস্তপদ আকর্ষিয়া যেন ঊর্দ্ধে তুলিতেছে হাত পা যেন ছোট হইয়া গিয়াছে—দীর্ঘতা হ্রাস পাইয়াছে এবং মাথাটা যেন অসম্ভব বড় হইয়াছে এ অদ্ভুত রোগ তো কেহ কখন দেখে

নাই কিন্তু উর্দ্ধটানের যে কঠোর আকর্ষণ, ইহা দেখিলে সহ্য হইত না প্রাণ ফাটিয়া যাইত হায়, হায়, যাহারা প্রীতির সুকোমল কুসুমে সে চারু অঙ্গ সাজাইয়াছে, প্রেমের সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিত করিয়াছে, অদৃষ্টপূর্ব্ব দারুণ ঊর্দ্ধ আকর্ষণের টানে সে অঙ্গ যেন বিচূর্ণীত করিতেছে, কৃপামৃতবর্ষী সে ফুল্ল নয়নযুগল ঊর্দ্ধতার করিয়া নিতেছে, সুগন্ধবহ শ্বাস রোধ করিতেছে, ইহা কি প্রাণে সহে? কিন্তু দুরন্তউর্দ্ধাকর্ষণ ভক্তচিত্ত বিদলিত করিতে মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে লাগিল

একদিন এইরূপ দারুণ দশা উপজাত হইয়াছে, ভক্তগণ ক্রন্দন করিতেছেন, হৃদয়কপাট খুলিয়া বিলাপ করিতেছেন তাহাদের মনে হইয়াছে, বুঝি ঠাকুর তাহাদিগের প্রেমের হাট ভাঙ্গিয়া চলিয়া গিয়াছেন নিরাশা, ভীষণ মুখব্যাদান করিয়া নিরাশারাক্ষসী সমুপস্থিত হইয়াছে ঠাকুর বুঝি তাহা বুঝিলেন, বুঝি ঊর্দ্ধ টানের আক্ষেপে ইষ্ট দর্শন ঘটিল বলিয়া উঠিলেন,—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" যেন ঠাকুর বহু পরিশ্রমের পর শ্রান্তি পাইলেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"—এই মধুর নামের মধুরতায় দেহ শান্ত হইল ভক্তগণ জয়ধ্বনি দিয় উঠিল, তাঁহারা সকলেই তখন দেহে প্রাণ পাইলেন

এই ধরা ধামে ঐ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" ধ্বনিই তাঁহার শেষ বাক্য, অতঃপর আর বাক্যোচ্চারণ করেন নাই সর্ব্বশেষ অবতার প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই শেষ যুগের অধম জীবের ভজনীয়—তাঁহারই নাম সবারই শেষ সম্বল, ইহাই বুঝাইতে যেন, সেই অবস্থায়ও শেষ একবার উচ্চারণ করিয়াছিলেন,—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

অতঃপর আর একবার সেই দারুণ ঊর্দ্ধাকর্ষণই তাঁহাকে ঊর্দ্ধদেশে

তুলিয়া রাখিয়া দিল। ১৩১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষষ্ঠী বৃহস্পতি বারের সেই ঊর্দ্ধগতি আর বারিত হইল।

যাও হে ঠাকুর নামের সাধক
যাও হে বাঞ্ছিত স্থানে,
যথায় গুরুর করুণা তরল
তর তর বহে প্রাণে।
লোকাপেক্ষা নাই, —বাহ্যিক লাঞ্ছনা
কেবল প্রেমের ধারা,
প্রেমের সাগর বহে নিরন্তর
প্রেমে গড়া সেই ধরা।
বসে রহ তথা নিরিবিলি মরি!
প্রেমামৃতময় স্থানে,
যথায় গুরুর করুণা তরল
তর তর বহে প্রাণে।

* * * *

ঠাকুরের প্রেমের হাট ভাঙ্গিল না,—সেই যে গুপ্ত গুহা,—যথায় নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেন, ভক্তগণ তাঁহাকে তখন সেই গুহায় অতি সন্তর্পণে লইয়া বসাইলেন। বায়ু যেন চলিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে উপরে একটি ছিদ্রবিশিষ্ট বংশী রাখিয়া কাঠের তক্তাতে গুহা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন ও তদুপরি একপ্রস্ত ইষ্টক ঢাকা দিলেন।

ইহাই সাধুর সমাধি। এইরূপে "ক্ষেমসহস্রের সাধু" সেই গুহাভ্যন্তরে বিরাজিত রহিয়াছেন।

ওঁ হরি ওঁ।

সম্পূর্ণ।

প্রথম

পরিশিষ্ট।

——ঃ০ঃ

পরবর্ত্তী সংবাদ

ঠাকুর স্বধাম গমনের পর আখড়ার অবস্থা কেমন হইযাছিল ?

আখড়ার ক্রমশঃ উন্নতিই দৃষ্ট হইতেছে, আখড়া চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ও দালান বেষ্টিত হইয়া সুচারুবেশ ধারণ করিয়াছে পশ্চিম প্রান্তে ঠাকুর সেবার জলতুলা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য একটি যুগ্ম কুণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড বলিয়া লোকে তাহাতে স্নান করিয়া আনন্দ অনুভব করে এখনও আখড়ায় দূর দূরান্তর হইতে লোকজন আগমন করতঃ কীর্ত্তনানন্দ অনুভব করে এই সমস্ত অনুরাগী জনের প্রদত্ত অর্থেই সেবার ব্যয় চলিয়া যায়

আখড়াতে বর্ত্তমানে বর্ষীয়সী সাধিকা ইন্দ্রমণি, গোপালকৃষ্ণ দত্ত ও তাঁহার স্ত্রী এবং সূর্য্যকুমার দেবই স্থায়ী ভাবে আছেন।

ঠাকুরের অপর ভক্তগণ সময় সময় আসিয়া থাকেন

ভাগীরথী দাসী—বর্ত্তমানে বৈষ্ণবী, ঠাকুরের প্রতি ভক্তিমতী ছিলেন মনোমোহিনীর পরলোক গমনে ঠাকুর প্রসাদ না পাইয়া যখন ক্রমাগত উপবাস করিতে আরম্ভ করেন একবিংশতি দিন অনাহারে থাকেন, ইন্দ্রমণিও অনুসঙ্গে যখন উপবাস ব্রত উদ্যাপন করেন, ভাগীরথী তখন আখড়াতেই থাকিতেন এবং তাঁহারই ন্যায় তিনিও উপবাস ব্রত প্রতিপালন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন

ভাগীরথী এখন আখড়ায় থাকেন না

পাঁচগাওবাসী দীননাথ দেব ঠাকুরের একজন ভক্ত একদা চৈত্রমাসে তিনি আখড়ায় আগমন করেন সেদিন শনিবার; ঢাক দক্ষিণের ঠাকুর-

বাড়ীতে প্রতি রবিবারে অনেক লোক শ্রীমহাপ্রভু দর্শনে গিযা থাকে ; দীন নাথ সেই যাত্রী লোকদেব উৎসাহ দেখিতেছেন

পশ্চিম পার্শ্বে পাকগৃহ, তাহার বারান্দায় বসিযাছেন, আর হাতে প্রসাদ লইয়াছেন এমন সময তিনি বলিলেন "লোক ঢাকাদক্ষিণে মহাপ্রভু দর্শনে যাইতেছে, কত আনন্দ পাইবে , ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর, আমাদের ভাগ্যে কি সে আনন্দ নাই ?'
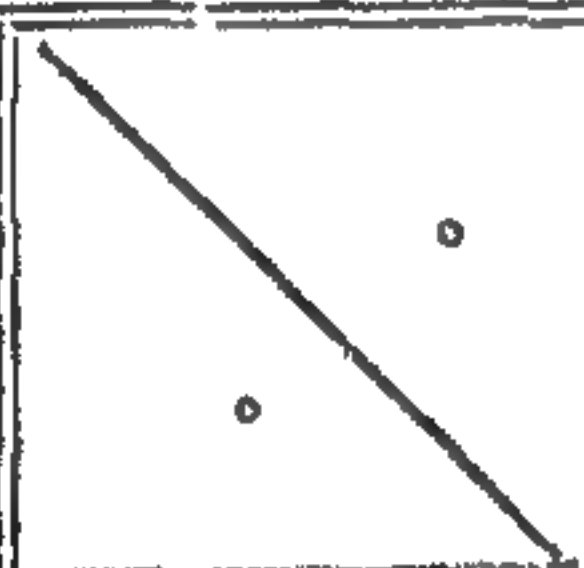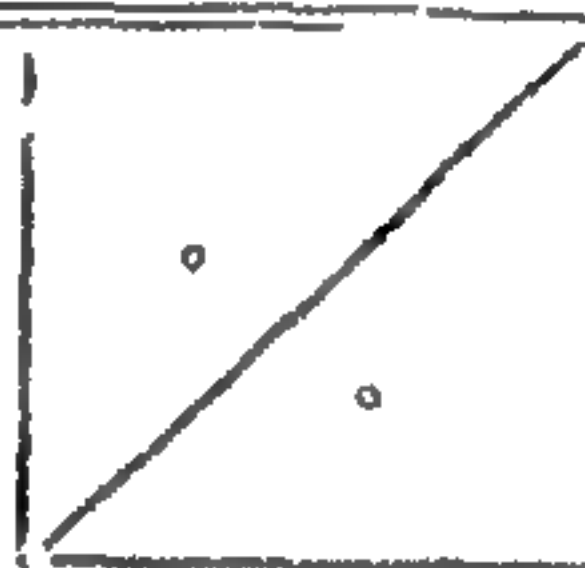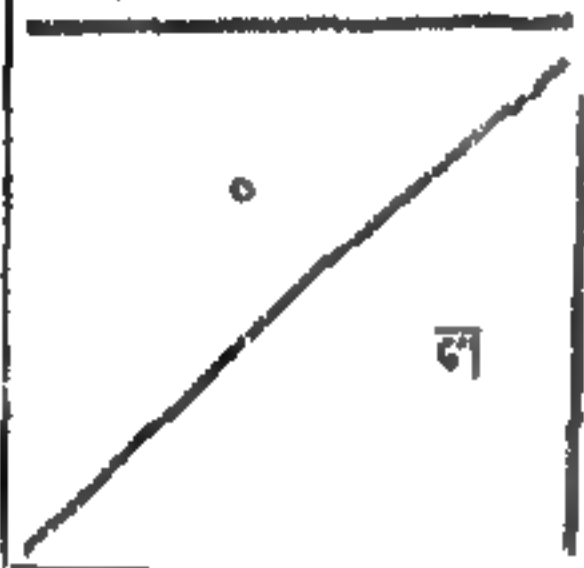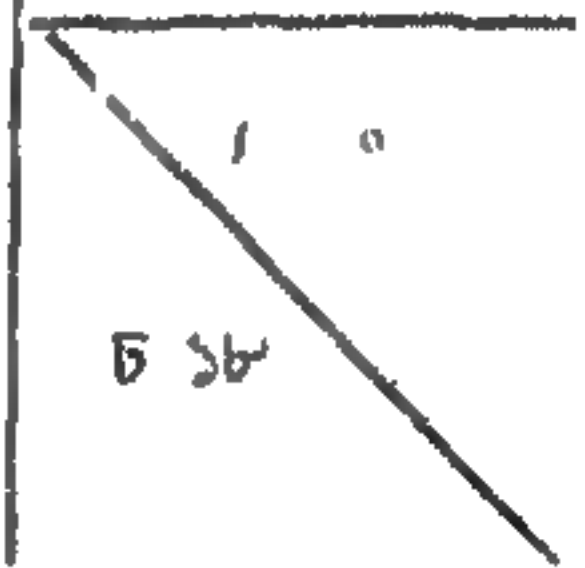
ঠাকুর ইহা শুনিলেন ও একটু হাস্য করিয়া বলিলেন—'মহাভাব যার হয, সেইতো মহাপ্রভুব দর্শন পাইবাব অধিকারী "

দীননাথের আব প্রসাদ খাওযা হইল না, হাতের প্রসাদ পডিয়া গেল , প্রেমানন্দে হঠাৎ দীননাথ বিহ্বল হইযা ভূমিতে পড়িলেন ঢাকাদক্ষিণ যাওযার ফল প্রেমানন্দ প্রাপ্তি, ভাগ্যবান দীননাথ এস্থলেই প্রাপ্ত হইলেন ; তাঁহার আশা মিটিল

চাটুবাবাসী মনারাম দেব ঠাকুবের চির অনুরাগী ভক্ত তাঁহার অন্য ভক্ত বেকামুরা-বাসী সুরানন্দ দেব এবং স্বগ্রামী রামলোচন কর এতদ্ব্যতীত আবও অনেক ভক্ত আছেন, এবং সর্ব্বদাই আখডায় আগমন করিয়া থাকেন, সকলেব নাম উল্লেখ বাহুল্য মাত্র

ঠাকুরের সহিত যাহাদের কোনরূপ সংস্রব ছিল না, যাহারা ভিন্নভাবাপন্ন তাহারাও আখড়ায আসিতে ইতস্ততঃ কবে না আখড়ায যেন হিংসা দ্বেষ নাই, আখডায সাম্প্রদাযিকতাব বন্ধন শ্লথ নির্ব্বিকার ও নিরাকাঙ্ক্ষ ঠাকুরেব আখড়ায বিকার ও আকাঙ্ক্ষাব দৌরাত্ম্য এ যাবৎ লক্ষিত হয় নাই আখড়াবাসিগণ যাচ্ঞাবিবহিত, যথাপ্রাপ্ত দ্রব্যেই তুষ্ট ; যদি দ্রব্যাভাব ঘটে, সে দ্রব্যব্যতীতই সেবা চলুক, ক্ষতি নাই ঠাকুরের উপরেই আখড়ার সব ভার এখনও ন্যস্ত রহিয়াছে তিনি যাহা করাইবেন,—হইবে তিনি সেবাব জন্য যাহা পাঠাইবেন, তাহাতেই সেবা চলিবে ইহাই সেবকবর্গেব অভিপ্রায এবং সঙ্কল্প , তাই বলিযাছি, এখনও তাঁহাব উপরই আখড়াব ভার [illegible] ; সেবকগণ যথার্থ সেবক বা পরিচালক মাত্র।

দ্বিতীয

পরিশিষ্ট

ঠাকুরের জাত পত্র

জাত—শকাব্দ ১৭৭৩।

১। জাতকের লগ্ন বুধের ক্ষেত্র হওয়ায ধর্ম্মে মতি

২ চারিটি গ্রহ একত্র থাকায প্রব্রজ্যাযোগ হইযাছে, এইজন্য জাতকের সংসারাশক্তি বিহীনতা ও সংসারে ঔদাসীন্য

৩। জাতকের মেষ কর্কট, ও মকরে গ্রহ থাকায চতুঃসাগর যোগ হইযাছে এই জন্য জাতক নরপতি অর্থাৎ লোকপূজিত হইযাছেন

'চার সাগরে গ্রহের মেলা
তার কোষ্ঠী না কর হেলা।'

৪ জাতকের তিন সাগরে বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকায়, নরপতি না হইলেও নিধি স্বয়ং তাঁহার কাছে আগত হইয়াছে

৫ জাতকের ধর্ম্মের গৃহে শুক্রের ক্ষেত্র হওয়ায়, এবং শুক্র তুলাতে স্বগৃহে থাকিয়া নিজ গৃহে ত্রিপাদ দৃষ্টি করায় জাতক পরম জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইয়াছেন

এতদ্ব্যতীত বুধ ও বৃহস্পতি এই শুভ গ্রহেরও ত্রিপাদ দৃষ্টি আছে

গ্রন্থ আরম্ভ—২রা পৌষ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।
গ্রন্থ সমাধা—১০ই পৌষ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

ইতি
শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি
কৃত সাধু-চরিত সমাপ্ত।

মতামত

উদ্ধৃত করিবার চেষ্টা করা গেল না তাহা করিতে গেলে এমন এক বহি ছাপাইতে হয় অচ্যুত বাবুর সরস, সরল মাধুর্য্যময়ী ভাষা ভগবৎকৃপায় সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সুপরিচিত তাঁহার কৃত প্রত্যেক গ্রন্থই সমালোচক ও দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সুপ্রশংসিত তাঁহার কৃত গ্রন্থ পাঠে শিশির বাবু "পুলকিত" হইতেন বান্ধবের কালীবাবু তাঁহার গ্রন্থ পাঠে বলেন যে পূর্ব্ব বঙ্গের মুখ যাঁহাদের কর্তৃক উজ্জ্বল হইবে, আপনি তাঁহাদের অন্যতম ইত্যাদি কিন্তু এ সকল বলিব না ; এই তদীয় নব প্রকাশিত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত সমালোচন দেখিয়াছেন কি ? ১৯১১ইং ১লা জুলাই তারিখের এম্পায়ার লিখেন যে, কি প্রণালীতে দেশের ইতিহাস লিখিতে হয়, বাঙ্গালী তাহা জানেন শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত লেখক বাঙ্গালী জাতির সে কলঙ্ক দূর করিলেন ইত্যাদি গত ১৩১৮ বাং আশ্বিন কার্ত্তিক যুগ্ম সংখ্যা ঐতিহাসিক চিত্রে লিখিত হয় যে, 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, ইহা নিতান্ত পুরাতন কথা হইলেও বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা, সে কলঙ্ক দূর করিবার জন্য, যাঁহারা এ যুগে ব্রতী থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে গৌরবান্বিত করিতেছেন, তাঁহারা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদের পাত্র যে কয়েক খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প আজ বহুদিন পরে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত হাতে পাইয়া সে ক্ষোভ দূর হইল ' ইত্যাদি "শ্রীচৈতন্য চরিত' প্রতিদ্বন্দ্বী পরীক্ষায় পঞ্চাশ টাকা মূল্যের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
সখা	সখী	৶০	২৩
প্রভাতে	প্রভাত	৭	১২
ভজনে মার্গে	ভজনমার্গে	১২	৮
হইতেছে	হইতেছে না ?	২৭	১৩
তাহারও	তাহাও	৩২	৭
যে	সে	৩৫	২
আখড়তে	আখড়াতে	৬১	১১
উন্মত্তবেশে	উন্মত্তাবেশে	৬৭	২১